গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ১ সংখ্যা ৩১ জুলাই - ৬ আগস্ট, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

৫ই আগস্ট স্মরণে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

৫ই আগস্ট, ১৯২৩ — ৫ই আগস্ট, ১৯৭৬

(৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসকে সামনে রেখে মহান নেতার কিছু শিক্ষা এখানে তুলে ধরা হল। ১৯৬৯ সালের ৩০ জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি স্টাডি ক্লাসের আলোচনার এটি অংশবিশেষ।)

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কাজ বড় কঠিন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তাটাকে আমরা ফাইট করতে চাই, সেই ব্যক্তিসত্তাটির কারণেই দেখা যায়, একজন ব্যক্তি, যে খানিকটা ভাসাভাসাভাবে হলেও বিপ্লব বোঝে এবং অনেক সময়ে লড়তে চায়, কিন্তু লড়তে চায় সে নিজের নিয়মে। একদিকে সে লড়তেও চায় বিপ্লবের জন্য, আর একদিকে সে তার স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ঝোঁকটিকেও বাদ দিতে পারে না। অথচ সে জানে না এই লড়াইয়ের সত্যিকারের প্রয়োজনবোধের উপলব্ধির সঙ্গে আর একটি উপলব্ধিও জড়িয়ে আছে— সেটি হচ্ছে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতাকেও বর্জন করতে হবে। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার লড়াইটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কখনই ঈপ্সিত ফল এনে দিতে পারে না। কারণ তা সমষ্টির পরিকল্পনাধীন নয়। তাই মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রামের অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, 'টু স্ট্রাগল বোথ ইন্‌ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড কালেক্‌টিভলি' (ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে সংগ্রাম করা)। কারণ একা লড়ে কেউ বিপ্লব করতে পারবে না। তাই কালেক্‌টিভলি কী করে লড়তে হয়, বিপ্লবীদের তা জানতে হবে, শিখতে হবে। একজনকে একা একটা জায়গায় সংগঠনের কাজ করতে দিলে যদি তার লড়াই করার একটা আকাঙ্ক্ষা এবং 'স্যাক্রিফাইস' (ত্যাগ স্বীকার) করবার একটু প্রেরণা থাকে, তাহলেই দেখা যায়, সাধারণ মানুষগুলিকে নিয়ে নিজের নেতৃত্বে সে খুব ভাল কাজ করে। কারণ তার নেতৃত্ব সেখানে 'আনডিস্‌পিউটেড' (অবিসংবাদিত), তার ব্যক্তিসত্তায় সেখানে বিশেষ ঘা লাগে না, তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কারোর টক্কর লাগে না, সে 'হিউমিলিয়েটেড' (অপমানিত) ফিল করে না, তার ইগোতে কোথাও আঘাত লাগে না। কিন্তু আর পাঁচটা কমরেড যারা 'প্যারালাল পার্সোনালিটি' (সমান্তরাল ব্যক্তিত্ব), তাদের সঙ্গে একটা পরিকল্পনায় মিলে একত্রে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় পরস্পর ব্যক্তিসত্তায় টক্কর লাগছে— আর তেমন কাজ হচ্ছে না, নানা গণ্ডগোল হচ্ছে। ফলে সকলে মিলে একত্রে পরিকল্পনা নিজের মত হয় ভাল, যদি অপরের মত অনুযায়ীও পরিকল্পনাটি হয়, সেই পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে কী করে কাজ করতে হয়, সেটি শিখতে হয়। এবং সেটি শিখতে গেলে নিজের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে হয়— না পারলে সেটি শেখা যায় না। এই স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে পারাটা শেখা যাবে কী করে? শিখতে গেলে একত্রে কাজ করতে করতে কালেকটিভকে মেনে কাজ করার অভ্যাসটি 'ডেভেলাপ' করাতে হবে। আমি অনেক সময় শুনি, কোনও কোনও কমরেড এই বলে তর্ক করেন যে, কালেকটিভ পদ্ধতিতে কাজ তাদের একেবারেই ভাল লাগে না। তাদের শুধু কী করতে হবে বলে দিয়ে একা ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁরা একাই সেই কাজ করে দিয়ে আসবেন। কী অদ্ভুত কথা! যেন তাঁরা এমন বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যে, একাই বিশ্বজয় করে ফেলবেন। একা কেউই বিশ্বজয় করতে পারবেন না। স্বয়ং ঈশ্বর পারেননি, অন্যরা আর কী পারবেন!

তাহলে মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেককে কালেকটিভের মধ্যে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। রুটিন ওয়ার্ক— যা বিপ্লবী সংগ্রামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ— তা বিপ্লবী কর্মীদের এই কালেকটিভের মধ্যে থেকে কাজ করবার অভ্যাস শেখায়, ধৈর্য শেখায়। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তা, যে অহম্ প্রতিনিয়ত তাদের 'ডিসিভ' করে (ঠকায়), ভুল পথের নির্দেশ দেয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সাহায্য করে। প্রত্যেকের মধ্যে তার যে নিজস্ব বুদ্ধি-বিচার তা তাকে একটা জিনিস করতে বলে, অন্যদিকে তার ব্যক্তিসত্তা তাকে তা করতে আটকায়, তাকে অন্যদিকে নিতে চায়। এই হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই যে প্রত্যেকের মধ্যে দু'টি

চারের পাতায় দেখুন

লালগড় স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প
প্রতিবাদে খোলা মাঠে ক্লাস করছে ছাত্ররা

মাওবাদী ধরার নাম করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসেনার যৌথ অভিযানে ক্ষতবিক্ষত লালগড় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। যে এলাকায় বিপিএলভুক্ত পরিবারগুলি পয়সার অভাবে রেশনটুকুও তুলতে পারে না, অনাহারে মৃত্যু যাদের শেষ পরিণতি বলে তাবড় সচিবগণ সচক্ষে দেখে যাচ্ছেন, তাদের কী কল্যাণ করছে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে এই যৌথ সেনা অভিযান?

এরকম অসংখ্য সঙ্গত প্রশ্ন আজ লালগড়ের মানুষের মুখে মুখে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ যে এলাকায় নেই বললেই হয়, সেখানে কেন এবং কোন অধিকারে স্কুলগুলো দীর্ঘদিন সেনা-পুলিশের দখলে? এদের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক গ্রামবাসী দুঃসাহসিক উদ্যোগ নিয়ে হাজারে হাজারে জড়ো হয়ে স্কুল মুক্ত করে পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। পুলিশ বেশ কিছু স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বিনপুর স্কুলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেও ক্যাম্প রাখতে পারেনি, তাদেরই হটে যেতে হয়েছে। লালগড় পার্শ্ববর্তী গোহমিডাঙা স্কুলের সামনে উপস্থিত হওয়ার অপরাধে ছোট ছোট

তিনের পাতায় দেখুন

ডি এস ও-র আন্দোলনে
ডোনেশনের টাকা ফেরতের নির্দেশ

ডি এস ও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের চাপে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভর্তির সময়ে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর নির্দেশ দিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন।

সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু স্কুল বেশি টাকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করেছিল। অতিরিক্ত টাকা ফেরতের দাবিতে ছাত্র সংগঠন ডিএসও-র পক্ষ থেকে কয়েক মাস ধরে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলন চলছে। ১৬ জুলাই ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসক দফতরের সামনে আর এক দফা বিক্ষোভ হয়। ১৫টি স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী বৃষ্টি মাথায় করে হাজির ছিল সেখানে। অভিভাবকেরাও ছিলেন। ডিএসও-র জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত ঢালি বলেন, "সরকারি নির্দেশ অমান্য করে স্কুলগুলি বেশি টাকা নিচ্ছিল। এরই প্রতিবাদে আন্দোলন"।

তিনের পাতায় দেখুন

যুদ্ধকালীন তৎপরতায়
খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, এ বার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অর্ধেকেরও কম হওয়ায় রাজ্য জুড়ে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাষিরা বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে রয়েছে। চাষের জন্য বৃষ্টির জলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা গড়ে না তোলা এবং ক্ষুদ্র সেচে চরম অবহেলাই রাজ্যকে এই পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর জন্য মূলত দায়ী সিপিএম নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার।

এমতাবস্থায় আমরা দাবি করছি, আর একটি দিনও নষ্ট না করে খরা মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নিতে হবে। চাষিরা যাতে চাষের প্রাথমিক কাজ চালাতে পারে তার জন্য ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী এবং ডিভিসি জলাধারগুলিতে যে পরিমাণ জল আছে তা থেকেই অবিলম্বে সেচ-ক্যানেলগুলিতে জল ছাড়তে হবে। স্যালো-ডিপ-টিউবওয়েল-মিনি ডিপ-টিউবওয়েলগুলি থেকে দিন-রাত জল তোলার জন্য জরুরিকালীন ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে এবং বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। চাষের পুরো সময়ে লোডশেডিং না হওয়ার গ্যারান্টি দিতে হবে। যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে পাম্প চালানোর জন্য অতি স্বল্প মূল্যে ডিজেল সরবরাহ করতে হবে। সেচ বহির্ভূত এলাকাগুলির জন্য কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কৃষকদের জন্য বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মৈপীঠে নাগরিক কমিটির কর্মী খুন, বিক্ষুব্ধ জনগণ সিপিএমের ঘাঁটি থেকে বন্দুক-বোমা উদ্ধার করল

সিপিএমের নৃশংস আক্রমণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী ব্লকের মৈপীঠে ১১ জুলাই মৈপীঠ নাগরিক কমিটির কর্মী প্রশান্ত দাস(৩৬) নিহত হয়েছেন। ঐ দিন রাত ৮টা নাগাদ প্রশান্ত তাঁর বাবা ও দুই ভাই-এর সাথে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি সিপিএমের দুষ্কৃতীরা ভোজালি, ছুরি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশান্ত দাসের পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়। বাবা ও ছোটভাইও গুরুতর আহত হন। অপর ভাই দৌড়ে হাইরোড মোড়ে খবর দিলে প্রচুর মানুষ দৌড়ে আসে, খুনিরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন আহত তিনজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায় এবং থানাতে অভিযোগ জানায়। ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে প্রশান্ত দাস মারা যান। তাঁর বাবা ও ছোট ভাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কিশোরীমোহনপুর সহ গোটা মৈপীঠ অঞ্চলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে গত ২০ বছর কিছু ছিল না। খুন করা, অত্যাচার করে হাত পা ভেঙে দেওয়া, জরিমানা, জমি কেড়ে নেওয়া, মেয়েদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। থানা চলত সিপিএম নেতাদের নির্দেশে। কিশোরীমোহনপুর ছিল অত্যাচারী হার্মাদদের জবরদস্ত ঘাঁটি। কিশোরীমোহনপুর বাদে গোটা মৈপীঠ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। লোকসভা ভোটের পর থেকে কিশোরীমোহনপুরে যখন সিপিএমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল তখন এক ভয়াবহ আক্রমণের ছক কষছিল সিপিএম নেতারা, যাতে সাধারণ মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএমের স্থানীয় নেতা মহাদেব মণ্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান মানবেন্দ্র শীট, শংকর দাস, উত্তম দলপতিরা গোপন বৈঠক করে হার্মাদদের সঙ্গে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ব্যক্তিগতভাবে কোনও দল এই পরিবার করেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে যে নাগরিক কমিটি গড়ে তুলেছিল ঐ পরিবারটি ছিল তার সমর্থক। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাদের চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, নেতারা রাস্তা চলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই পরিবারটি মাথা নোয়ায়নি। তাই সিপিএম তাদের উপর এই অত্যাচার নামিয়ে আনল এবং পরিবারের বড় ছেলেকে খুন করল।

এই ঘটনার পর এলাকায় প্রবল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ দলবদ্ধভাবে হার্মাদদের গোপন ঘাঁটি খুঁজতে শুরু করে। সিপিএম নেতারা ও হার্মাদেরা গোটা মৈপীঠ অঞ্চল থেকে রাতারাতি পালিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সিপিএম নেতাদের বিভিন্ন আস্তানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ পর্যন্ত ৭টি বন্দুক, প্রচুর বোমা, ১টি রিভলবার পাওয়া গেছে। প্রয়াত প্রশান্ত দাসের মরদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্য হাসপাতাল থেকে আনার সাথে সাথে সিপিএম নেতাদের নির্দেশে প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা অমান্য করে প্রায় ৪ হাজার মানুষ মরদেহ নিয়ে শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এস ইউ সি আই মৈপীঠ লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোরঞ্জন পণ্ডিত বলেন, এখন এলাকার গরিব সাধারণ মানুষ সিপিএমের দীর্ঘদিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ। সিপিএম নেতারা তাই তলে তলে গোটা এলাকায় প্রতিবাদী জনগণের এই ঐক্য ভেঙে দিতে পুনরায় বন্দুকরাজ কায়েমের ছক কষছে। এ ব্যাপারে তিনি এলাকার মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

শিলচরে প্রবীণ পার্টিসংগঠকের জীবনাবসান

আসামের এস ইউ সি আই কাছাড় জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড পীযূষ ভট্টাচার্য ১৪ জুলাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে শিলচর মেডিকেল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৯ সালে কমরেড ভট্টাচার্য দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন দলের একনিষ্ঠ কর্মী। সত্তরের দশকে ধোয়ারবন্দের বাগান অঞ্চলে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

১৫ জুলাই সকালে প্রয়াত কমরেডের মরদেহ কাছাড় জেলা কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দলের পক্ষ থেকে কমরেড প্রদীপ দেব, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে কমরেড নকুলরঞ্জন পাল, এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে কমরেড আশুকান্তি সিনহা ও সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে কমরেড দুলালী গাঙ্গুলী মরদেহে মাল্যদান করেন। এ দিন দলের জেলা কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। মরদেহ দলের ধোয়ারবন্দ আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়ে গেলে দলের আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন প্রবীণ সদস্য কমরেড যোগেশ চন্দ্র বড়াইক ও অন্যান্য কমরেডরা।

২১ জুলাই ধোয়ারবন্দে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ঘোষ। প্রয়াত কমরেডের ছবিতে দলের আসাম রাজ্য কমিটির পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব। অন্যরাও বক্তব্য রাখেন। সকল বক্তাই কমরেড পীযূষ ভট্টাচার্যের অমায়িক ব্যবহার, গরিব মেহনতি মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা, দলের প্রতি গভীর আনুগত্য, অন্যায় কাজকর্মের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধস্পৃহা প্রভৃতি চরিত্রের নানা গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

কমরেড পীযূষ ভট্টাচার্য লাল সেলাম

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই রামপুরহাট লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড বিদ্যাপতি সাহা(৬২) জটিল স্পন্ডেলাইটিস ও কিডনিজনিত রোগে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৭ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭২ সালের শেষভাগে কমরেড বিদ্যাপতি সাহা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিষ্ণুপুর, হাঁসন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে লড়াই আন্দোলনে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। খাস জমি উদ্ধার, মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে একাধিকবার তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে বিপিটিএ-র আজীবন সদস্য ছিলেন। দরদী মন, সহজ, সরল, বিনয়ী মিষ্ট ব্যবহারে এলাকার মানুষ এবং কর্মী সমর্থকদের একান্ত আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ আসার পর রামপুরহাট অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। রক্তপতাকায় সজ্জিত মরদেহ লোকাল অফিসে আনার পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, জেলা সম্পাদক কমরেড জিয়াদ আলি বক্সী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জীর পক্ষে মরদেহে মাল্যদান করা হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন ঘটক, লোকাল সম্পাদক কমরেড আতাহার রহমান, বিভিন্ন গণসংগঠনের জেলা ও লোকাল কমিটি, বিভিন্ন কমরেড ও তাঁর পুত্র অসীম সাহা এবং স্থানীয় গুণমুগ্ধ মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ তাঁর গ্রাম পোড়ডায় নিয়ে যাওয়া হলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু মানুষ ছুটে আসেন। এখানে অগণিত মানুষের সাথে শ্রদ্ধা জানান তাঁর আজীবন সংগ্রামের সাথী কমরেড বৈদ্যনাথ মাল, নলহাটী থানার প্রবীণ কমরেড সিরাজউদ্দৌল্লা, স্থানীয় কমরেড ও তার অপর পুত্র কমরেড আশীষ সাহা। কমরেড বিদ্যাপতি সাহার মৃত্যুতে দল হারালো এক নির্ভরযোগ্য সংগঠককে, এলাকার মানুষ হারালো তাদের অতি প্রিয়জনকে।

কমরেড বিদ্যাপতি সাহা লাল সেলাম।

পরিচারিকা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ন্যূনতম বেতন আইনের আওতাভুক্ত করা, সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু প্রভৃতি দাবিতে ১৯ জুলাই বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন। দুই শতাধিক পরিচারিকা বারাসত স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল করে সভাস্থলে পৌঁছান। কাজ করতে গিয়ে পরিচারিকারা কী ধরনের সমস্যা ও বেদনাময় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, সে সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত আবেগের সাথে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড লিলি পাল সংগঠনের গড়ে ওঠা এবং আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য নেতা কমরেড অশোক দাস সংগঠনকে জেলা জুড়ে মজবুত করার আহ্বান জানান। শিখা দাসকে সভানেত্রী এবং রেহেনা দফাদার ও রাজলক্ষ্মী দাসকে যুগ্মসম্পাদিকা করে ৩২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার রাজ্যের প্রাণীবন্ধুরা

সিপিএম সরকারের শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কাজের আর একটি ক্ষেত্র হল প্রাণীবিকাশ দপ্তর। দপ্তরের অধীনে কর্মরত প্রাণীবন্ধুরা গরু-মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো, হাঁস মুরগির প্রাথমিক শুশ্রূষা, টিকাকরণ, সবুজ গো-খাদ্য নিয়ে প্রাণীপালকদের উৎসাহ দেওয়া, প্রাণীপালন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা ইত্যাদি কাজ গ্রামে ঘুরে ঘুরে করেন। কিন্তু এদের না আছে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, না আছে কোনও বেতন, না আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পের সুবিধা। শূন্য এল ডি এ পদ পূরণে যোগ্য প্রাণীবন্ধু কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এমনকী গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই কাজ করার জন্য পরিবহন খরচটুকুও দেওয়া হয় না। এরা এই কাজ করার জন্য প্রাণীপালকের কাছ থেকে ৩০ টাকা নেয়, যার ২০ টাকাই সরকারকে দিয়ে দিতে হয়। ফলে চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার প্রাণীবন্ধুরা। প্রাণীবন্ধুরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির। কিন্তু সিপিএম সরকারের ও এই দপ্তরের মন্ত্রী আনিসুর রহমান এই দাবি উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি সরকার প্রাণীবন্ধুদের জন্য উৎসাহ ভাতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই ঘোষণা যে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি ও বেতনদানের পরিপন্থী তা প্রাণীবন্ধুদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সরকারের বিরুদ্ধে।

সরকার প্রাণীবন্ধুদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কাজ আদায়ে এক কালাচুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সিপিএম সরকার বলেছে, (১) প্রাণীবন্ধুরা পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না, (২) চাকরির দাবি করতে পারবেন না, এবং কোনও সরকারি দপ্তরে নিয়োগ পাবার অধিকারী হবেন না, (৩) বছরের সবদিনই কাজ করতে হবে, কোনও ছুটি থাকবে না, (৪) প্রথমবারের পর প্রজনন সংক্রান্ত সরঞ্জাম সরকার দেবে না, প্রাণীবন্ধুকেই নিজ ব্যয়ে কিনে নিতে হবে। ফলে এটা পরিষ্কার যে, শ্রমিক শোষণের এক মারাত্মক ক্ষেত্র এই প্রাণীবিকাশ দপ্তর এবং সিপিএমের সৌজন্যে তা অবাধে চলছে।

রাজ্যের প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে একজন করে মোট ৩০৩৮ জন প্রাণীবন্ধু রয়েছেন। তাদের জীবনজীবিকা বিপন্ন। বাঁচার আন্দোলন তীব্রতর করতে ২৮ জানুয়ারি মৌলালি যুবকেন্দ্রে সারা বাংলা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন 'সারা বাংলা প্রাণীবন্ধু কর্মচারী ইউনিয়ন'। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এই ইউনিয়ন ২২ জুলাই প্রাণীবিকাশ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। তার আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি, এ আই ইউ টি ইউ সি'র কলকাতা জেলা সম্পাদক শান্তি ঘোষ, সংগঠনের সম্পাদক ইকবাল আহমেদ সরকার, চন্দন আচার্য, কউসর রহমান। এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার এবং এ আই ইউ টি ইউ সির রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য তাঁদের বক্তব্যে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই কালাচুক্তির তীব্র নিন্দা করেন। দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগণা, হুগলি, বীরভূম, নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলার প্রাণীবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে খড়্গপুরে বিক্ষোভ

আবেদনকারী সমস্ত পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জকপুর স্টেশন সংলগ্ন ঘোলাগেড়িয়া গ্রামের প্রায় তিনশো মানুষ ১৩ জুলাই বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা এ ই-র উদ্দেশে এক স্মারকলিপি জমা দেন। অ্যাবেকার পক্ষ থেকে রঞ্জিত গুপ্ত এবং সুরঞ্জন মহাপাত্র এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে কার্তিক দোলই, মদন খান, সুকুমার দোলই, দিলীপ দোলই, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, শম্ভু দোলই, উত্তম দোলই, মৃণালকান্তি মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট আদৌ জনমুখী নয়

সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কমরেড তরুণ মণ্ডল ১৪ জুলাই বলেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনমুখী তথা 'আম আদমি'র বাজেট বলা যায় না। এই বাজেট দেশের ৮০-৮৫ ভাগ লোকের কোনও উপকারেই আসবে না। আগামী ১০০ দিনের মধ্যে জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমানোর কোনও ঘোষণা বাজেটে নেই। খাদ্যশস্য, কেরোসিন ও অন্যান্য দ্রব্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধের কোনও ঘোষণাও এই বাজেটে করা হয়নি। যদিও খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয়মূল্য সামান্য বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা কৃষকদের, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উৎপাদকদের প্রয়োজন পূরণ হবে না। বাজেটে বিপুল সংখ্যক কর্মহীন যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের কোনও গ্যারান্টি, কিংবা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং বন্ধ কলকারখানা খোলার কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি। অথচ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা এবং বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি করতে এই পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত জরুরি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের (এনআরইজিএ) অধীনে বছরে অন্ততপক্ষে ২০০ দিন কাজ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল এবং দৈনিক মজুরি স্থির করা দরকার ছিল দৈনিক ন্যূনতম ১৫০ টাকা।

শিক্ষা নিয়ে এদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে স্বপ্ন ছিল, বেসরকারি পুঁজিকে শিক্ষা ব্যবসায় অবাধে লগ্নি করতে দিয়ে সরকার সেই স্বপ্ন ধ্বংস করছে এবং শিক্ষাকে ক্রমেই আরও মহার্ঘ ও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত এবং ১৯৬০ সালে দেওয়া কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ব্যাপক বেসরকারীকরণ এদেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বাস্থ্যের অধিকার ক্রমেই আরও বেশি করে কেড়ে নিচ্ছে। সুতরাং ভোরে কমিটি ও মুদালিয়ার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মোট বাজেট বরাদ্দের ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করা প্রয়োজন এবং বর্তমানে যে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা বহাল রয়েছে, তা রক্ষা করা ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ করা সহ এই ব্যবস্থার উন্নতিসাধন সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেচ ব্যবস্থা খুবই অবহেলিত এবং দেশের মোট কৃষিজমির ৬২ শতাংশই এখনও সেচের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। সেচ ব্যবস্থার দিকে যথাযথ নজর দেওয়া এবং অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতি যদি না পাল্টায়, তবে সারের দাম আরও বাড়বে এবং সাথে সাথে বাড়বে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা। আগামী ৫ বছরের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করে গোটা বিশ্বকে সরকারের দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে ভারত তার ১০০ কোটির বেশি দেশবাসীর জন্য পানীয় জল সরবরাহ করতে সক্ষম। এরই সাথে বাৎসরিক ন্যূনতম আড়াই লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত আয়করে ছাড় দেবার যে প্রস্তাব অন্য সদস্যরা তুলেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। এর দ্বারা দেশের প্রবীণ গ্রুপ ডি কর্মচারীরা অন্তত উপকৃত হবেন। বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যসম্পন্ন ব-দ্বীপ অরণ্য সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য আমি 'সুন্দরবন প্যাকেজ' আশা করেছিলাম। তবে আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনে পুনর্গঠনের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যদি কড়া নজরদারি করা না হয়, তাহলে বরাদ্দ অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়ছয় করতে পারে। অনুৎপাদনশীল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এবারও বাজেটে বরাদ্দ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে, যার দ্বারা শুধুমাত্র বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতাই আরও শক্তিশালী হবে।

হাওড়ায় মোটরভ্যান চালকদের সমাবেশ

অবিলম্বে মোটরভ্যান চালকদের বৈধ লাইসেন্স দেওয়া, বিমা প্রকল্পের আওতায় আনা, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, সস্তা দরে ডিজেল সরবরাহ এবং পুলিশি জুলুম বন্ধ করার দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ২০ জুলাই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার হলে। বিভিন্ন স্ট্যান্ডে সিপিএম নেতৃত্বের ভয়-ভীতি দেখানো সত্ত্বেও সাত শতাধিক মোটরভ্যান চালক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মোটরভ্যান বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকার এবং বাস মালিকরা যে যৌথ চক্রান্ত করছে তার তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং আগামী দিনের আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ জৈমিনী বর্মন, অলোক ঘোষ, দেবাশিস রায়, কালিকিঙ্কর সামন্ত, তপন গিরি প্রমুখ।

কমরেড অলোক ঘোষকে সভাপতি এবং কমরেড কালিকিঙ্কর সামন্তকে জেলা সম্পাদক করে ২৫ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নব নির্বাচিত জেলা সদস্যদের নিয়ে সংগঠন এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সম্মেলনের পূর্বে ব্যানার, দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড দিয়ে সুসজ্জিত এক মিছিল জেলাশাসক অফিসের দিকে যায়। পুলিশ উড়াল পুলের তলায় মিছিলটি আটকে দেয়। কমরেড অলোক ঘোষের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

মোটরভ্যান চালকদের সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

খোলা মাঠে ক্লাস করছে ছাত্ররা

একের পাতার পর

ছেলেমেয়েদের উপর ২০ জুলাই বেপরোয়া লাঠি, টিয়ারগ্যাস, বন্দুকের কুঁদো চালিয়ে তাদের রক্তাক্ত করেছে মোতায়েন বীরপুঙ্গব জওয়ানেরা। সরকারে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের চিহ্নটুকুও আছে কি? লুটিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের হাত পা ভেঙেছে, মা-বাবাদের মাথা ফেটেছে, কিন্তু মনোবল ভাঙেনি। আবার ২১ জুলাই প্রতিবাদ মিছিলে ১৫ হাজার মানুষ সামিল। ২২ জুলাই শত শত ছাত্রছাত্রী রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে লাগাতার অনশনে বসেছে। হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা কচি কচি ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষার দাবিতে দিনের পর দিন না খেয়ে অনশনে আছে। এতেও টনক নড়েনি শিক্ষামন্ত্রী এবং 'সংস্কৃতিবান' মুখ্যমন্ত্রীর! এই শিক্ষামন্ত্রী, এই মুখ্যমন্ত্রী তবে কাদের জন্য?

অনশনের ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নির্বিকার সরকারের প্রতি একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে এলাকার 'অশিক্ষিত' আদিবাসী, মাহাত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষ চোয়াল শক্ত করে গড়ে তুলেছেন পাল্টা স্কুল। খোলা মাঠে ত্রিপলের তলায়। ২৪ জুলাই ঐ স্কুলেই শিক্ষকরা ক্লাস নিলেন। বিকল্প ব্যবস্থায় স্কুল চালানোর এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের পর গ্রামের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, এগিয়ে এসে আরও ক্লাস রুম তৈরিতে যোগ দিয়েছেন। ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র মেদিনীপুর জেলার নেতা-কর্মীরা এই নজিরবিহীন উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ২৫ জুলাই অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সংহতি জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের। গ্রামবাসীদের অনুরোধে সারা ভারত ডিএসও'র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আহ্বায়ক কমরেড ভীম মণ্ডল উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে বলেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বুকে নিয়ে লালগড়ের মানুষের শিক্ষা আন্দোলনের পাশেও আমরা আছি ও থাকব। শত অত্যাচার এই আন্দোলনকে দমাতে পারবে না।

প্রধান শিক্ষক নিমাই চন্দ্র পাত্র বলেন, অনশনে ৭০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। একজন ছাত্র এবং অষ্টম শ্রেণীর দু'জন ছাত্রী প্রিয়ঙ্কা বেজ এবং সুমি মুর্মু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তপন মণ্ডল, অরুণ বেজ দাবি করেন, স্কুলের মিড ডে মিল অবিলম্বে চালু করতে হবে। সংহতি জ্ঞাপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডি এস ও সংগঠক কমরেড মহাদেব প্রতিহার ও কমরেড তপন সামন্ত।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মগরাহাটে আন্দোলন

১৩ জুলাই এস ইউ সি আই উস্থি লোকাল কমিটির উদ্যোগে উস্থি অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংস্কারহীন সমস্ত রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবিতে মগরাহাট বিডিওতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঐদিন সকাল থেকে মোটরভ্যান, রিক্সাভ্যান বন্ধ রেখে চালকরা ও এলাকার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। দুই শতাধিক মানুষের স্লোগান মুখরিত বিক্ষোভ মিছিল দেউলা স্টেশন থেকে উস্থির বিডিও দপ্তরে পৌঁছায়। কমরেডস্ আব্দুর রউফ বৈদ্য ও গোরা জমাদারের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল বিডিও'র সাথে দেখা করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুর রউফ বৈদ্য, গোরা জমাদার, অরুণ সাউ, মণি সেখ প্রমুখ।

টাকা ফেরতের নির্দেশ

একের পাতার পর

বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কমরেডস্ অসীমা নস্কর ও নিপন জমাদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন জেলাশাসকের সঙ্গে। জেলাশাসক বলেন, "যে সব স্কুলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা সেই টাকা ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করার জন্য মহকুমা শাসকের মাধ্যমে স্কুল পরিদর্শকদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে।" মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাসে ভর্তির জন্য গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুলগুলিতে ৬৩ টাকা নেওয়ার কথা। বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৯০ টাকা এবং ল্যাবরেটরির জন্য আরও ১২ টাকা করে নেওয়ার কথা। কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির খরচ ৭৭ টাকা। স্কুলগুলি ওই টাকা নেওয়ার পাশাপাশি অন্য নানা খাতে 'ডোনেশনের' নামে বেশি টাকা নিচ্ছে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ প্রতিমা নস্কর, অরুন্ধতী প্রামাণিক, জেলা সম্পাদক কমরেড রামকুমার মণ্ডল, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড অর্ধেন্দু সরকার ও রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড গোপাল সাহু।

বিভিন্ন স্কুলে বাড়তি ফি ফেরত

ক্যানিং-এর ঘুটিয়ারি বালিকা বিদ্যালয়, বি এম বিদ্যাপীঠ ও সংগ্রামীনগর সহ বিভিন্ন স্কুলে কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা ডোনেশনের নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে নিয়েছে। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই গরিব ঘরের। অভিভাবকরা ভ্যানরিক্সা চালিয়ে, কলকাতায় দিনমজুরি করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ জোগান। তাঁদের পক্ষে এত উচ্চ হারে ফি দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ফলে তাঁরা বর্ধিত ফি কমাবার ও ডোনেশন হিসাবে নেওয়া বাড়তি টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে একমাস ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা ডেপুটেশন দেন, স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে থাকেন। অবশেষে ২০ জুলাই সেভ এডুকেশন কমিটি এবং ডি এস ও'র নেতৃত্বে অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান। ঘুটিয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দীর্ঘ আলোচনার পর ঘোষণা করেন, বাড়তি টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আন্দোলনের সাফল্যে অভিভাবকরা এলাকায় মিছিল করেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে পিন্টু দে, লাল্টু শেখ, প্রাণতোষ সরদার, নারায়ণ নস্কর এবং ডি এস ও নেতা সুশান্ত ঢালি। মন্দিরবাজার ঘাটেশ্বর বয়েজ হাইস্কুলে ডি এস ও জেলা কমিটির সদস্য অরবিন্দ প্রামাণিকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত ফিতে ভর্তি, অতিরিক্ত টাকা অবিলম্বে ফেরত ও সর্বশিক্ষা মিশনের বুকগ্রান্টের যথাযথভাবে সরবরাহ এবং শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ১৮ জুলাই অভিভাবকদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ ২৫ জুলাই অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং সেইমতো টাকা ফেরত দেয়। অতিরিক্ত টাকা ফেরত পাওয়ায় ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি প্রবল সমর্থন এবং উৎসাহ লক্ষিত হয়।

এই আন্দোলনের জয় ঘাটেশ্বর গার্লস হাইস্কুলে ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাঁচ শতাধিক ছাত্রী এবং অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে ডেপুটেশন দেন। কিন্তু তিনি দাবি মানতে অস্বীকার করেন এবং পুলিশ দিয়ে আন্দোলন ভাঙতে চান। তাতে আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেয়। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ৫ আগস্ট থেকে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে কুলতলী ব্লকে ভুবনেশ্বরী জয়কৃষ্ণ হাইস্কুল ও ভুবনেশ্বরী করুণাময়ী গার্লস হাইস্কুল এবং জয়নগর ব্লকে নলগোড়া বৈকুণ্ঠপুর বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের চাপে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

জিনিসের লড়াই — এটাও আজকের সমাজের বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের লড়াইয়ের প্রতিফলন। এই অবস্থায় হয় নিজের মতটাকে কালেকটিভের মতে পরিণত করতে হবে, না হয় কালেকটিভের মতটা নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলেও সেই মতটাকেই খুশি মনে মেনে নিয়ে চলতে হবে। এ মানসিকতা যদি না থাকে, তাহলে একত্রে চলতে চলতেই নিজের মনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, নিজের মধ্যে যে বুর্জোয়া সত্তা, যেটা ব্যক্তিসত্তার রূপে, 'আলট্রা' (উগ্র) স্বাধীনতার রূপে, স্বাধীনচেতা মনোভাবের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে— তাকেই একজন লালনপালন করবে। শুধু তত্ত্ব করে মনে মনে ভেবে একজনের মধ্যে যে কুসংস্কার, ব্যক্তিসত্তা, ইন্‌ডিভিজুয়ালিটি বা অহম্ আছে, তা দূর করা যায় না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে যে চেতন সত্তাটি পারিপার্শ্বিকের সাথে সংঘাতের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে, আবার বিরাজও করছে সেই সংঘাতের মধ্যে — সেই সংঘাতের স্বরূপ নির্ধারণ করে যে সঠিক পথটি পাওয়া গেল, সেই পথে যদি চেতনসত্তাটি নিজের কর্মকে নিযুক্ত করতে পারে, তবে সে যেমন বস্তুকেও প্রভাবিত করে, নিজেকেও উন্নততর করে। আর তা না হলে সে অধঃপতিত হয়।

'ইগো' ও 'সুপারইগো'র শ্রেণীচরিত্র

আমরা জানি, যে কোনও মানসিক ভাবনাধারণা — তা 'ইগো' হোক, 'ইনস্টিংক্ট' (সহজাত প্রবৃত্তি) হোক দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এই ইগো বা ইনস্টিংক্ট সমাজ পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে এক থাকে না। একটি বিশেষ সমাজের মূল দ্বন্দ্ব সেই বিশেষ সমাজের ভাবনাধারণার কাঠামোটি গড়ে দেয়। সমস্ত মানসিক ভাবনাধারণাই 'স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন', অর্থাৎ ভাবগত উৎপাদন— সচেতন মনের ক্রিয়া। যখন সামন্তী সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে 'সার্ফ'দের, ভূমিদাসদের লড়াইটা সমাজের মূল দ্বন্দ্ব ছিল, তখন সেই মূল দ্বন্দ্বের প্রতিঘাতে তখনকার ইগো, ইনস্টিংক্ট, মানসিকতাগুলো একরকম প্রতিভাত হয়েছে। আবার আজকের সমাজে যে ইগো, ইনস্টিংক্ট, মানসিকতাগুলো আছে, মূল কাঠামোতে তা সামন্তী সমাজের সঙ্গে একেবারে একরকম নয়। প্রবৃত্তিকে অনেক সময় 'ইম্‌মিউটেবল' বা পরিবর্তনাতীত মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। প্রবৃত্তি বলতে প্রবৃত্তির এক একটা 'গিভেন' (বিশেষ) 'ক্যাটিগরি' আছে, কাঠামো আছে। এক একটা 'মেটেরিয়াল কন্ডিশন' (বাস্তব অবস্থা) সেই বিশেষ কাঠামোটির পরিধি নির্দেশক কন্ডিশন।

যে কোনও ভাবনাধারণা— অর্থাৎ যে কোনও চিন্তা, ভাব, ধারণা, কল্পনা— সমস্ত কিছুই মানুষের মনে গড়ে উঠছে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের প্রতিফলনে। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে বিশ্লেষণ করবার, চিন্তা করবার যে ক্ষমতা রয়েছে— যে প্রক্রিয়াটি জন্তু-জানোয়ারের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে নেই, শুধু মানুষের মস্তিষ্কের গঠনে আছে, সেই প্রক্রিয়াটি থাকার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মনন জগৎ গড়ে উঠেছে। বস্তুজগতের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদেরও সংঘাত হচ্ছে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের গঠনে এই প্রক্রিয়াটি না থাকার ফলে তারা 'সাবজেক্ট টু ন্যাচারাল ল', অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূতই থেকে গেছে। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও আচার-আচরণই 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন' (পরাবর্ত ক্রিয়া)— অর্থাৎ 'কন্ডিশনড রিফ্লেক্স' (শর্তাধীন পরাবর্ত) এবং 'আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্সে'র (শর্তহীন পরাবর্ত) দ্বারা পরিচালিত। তার দ্বারাই তারা সব কিছু করে। তাদের 'ইনটেলিজেন্স' (বুদ্ধি শুদ্ধি) সম্পর্কে যাই বলা হোক, তা কন্ডিশনড রিফ্লেক্সেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মধ্যে সেখান থেকে আর একটা প্রক্রিয়া ফলো করে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে— যেটা 'সেন্‌সেশন টু মোটর অ্যাকশন'-এ (সংবেদন থেকে পেশী সঞ্চালন) এসে 'রিফ্লেক্স অ্যাকশনে'ই শেষ হয়ে যাচ্ছে না — আর একটা 'সিগ্‌ন্যাল' (সংকেত) দ্বারা, দ্বিতীয় সিগ্‌ন্যাল সিস্‌টেম দ্বারা একটা নতুন 'ট্রাক' সৃষ্টি হচ্ছে — সেই ট্র্যাকটি 'লিডিং টু পারসেপশন, কনসেপসন অ্যান্ড দেন টু ইমোশন' (গতিপথটি ভাব, উন্নততর ভাব ও তারপর আবেগের সৃষ্টি করে)। জন্তু-জানোয়ারের যেখানে শুধু 'ফিজিক্যাল ব্লাইন্ড ইমোশন'(অন্ধ শারীরিক ক্রিয়া)— অর্থাৎ 'ইমোশনাল নার্ভাস অ্যাকটিভিটি ইজ দি ওনলি পসিবল অ্যাকটিভিটি' (অন্ধ স্নায়ু ক্রিয়াই একমাত্র সম্ভাব্য ক্রিয়া), সেখানে মানুষের ক্ষেত্রে এই অ্যাকটিভিটি আরও উচ্চ স্তরে কাজ করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, 'ফ্রম ব্লাইন্ড ইমোশন টু রিজনিং থ্রু প্রসেস অব ট্রান্সলেসন' (চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ধ স্নায়ুক্রিয়া থেকে যুক্তিতে পৌঁছানো)— সেখান থেকে 'পারসেপচুয়াল নলেজ', তার থেকে 'কনসেপচুয়াল নলেজ' এবং শেষপর্যন্ত আবার একটা উন্নত ধরনের ইমোশন।

সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা দু'ধরনের ইমোশন দেখতে পাই। একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড টাইপ অব ইমোশন— যেটা 'নট টিউন্‌ড অর গাইডেড বাই রিজন্ অর কনসেপচুয়াল নলেজ' (যুক্তি বা উন্নততর ভাব ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত নয়)। এই ব্লাইন্ড ইমোশনও মানুষকে চালায়। এই ব্লাইন্ড ইমোশন হচ্ছে অন্ধের মতন। এখানে মানুষের আচরণ খানিকটা জানোয়ারের মতোই, অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, পরিবেশের দাস। এই ইমোশনাল মুভমেন্টটা মানুষকে হঠাৎ বড়ও করে দিতে পারে, মানুষকে একদম নিচেও নামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং এই ইমোশন অন্ধ। এর ওপর নির্ভর করা চলে না। এই ব্লাইন্ড ইমোশন থেকে ট্রান্সলেসন-এর মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পারসেপচুয়াল নলেজ গড়ে ওঠে সেও ভাসাভাসা জ্ঞান। তার দ্বারাও মানুষ এই 'ইমোশনাল কারভেচার'টিকে (অন্ধ স্নায়ুক্রিয়ার বিশেষ গতিকে) পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারে না। তার থেকে যে কনসেপচুয়াল নলেজ, অর্থাৎ কংক্রিট নলেজ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় যেটা 'গাইডেন্স প্রোভাইড' (পথ প্রদর্শনের) করার ক্ষমতা রাখে, সেই কংক্রিট নলেজ-ই ব্লাইন্ড ইমোশনকে 'প্যাটার্ন' করে (একটি আদলে গড়ে তোলে), 'টিউন' করে (একটি বিশেষ সুরে বেঁধে দেয়)। ফলে এর থেকে যে ইমোশন রিলিজড হয় সেটা বেস্‌ড অন নলেজ (জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে) — অর্থাৎ চেতনার ওপর, নলেজ-এর ওপর আবার ইমোশন। বিপ্লবীদের যে ইমোশন আমরা দেখতে পাই সেটা এই চেতনার ওপর ইমোশন। তাই একে রাশ টেনে ধরতেও তারা পারে। এই ইমোশন তাদের বিপথগামী করে দেয় না, তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না। যে আবেগ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা হ'ল, সেই প্রথম আবেগ যেটা ব্লাইন্ড ইমোশন। কিন্তু যে আবেগ বেস্‌ড অন নলেজ অ্যান্ড রিজন্, সেটা ব্লাইন্ড ইমোশন-এর থেকেও আরও কার্যকরী, আরও 'ডিসিসিভ'।

স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী সমাজেও মানুষের সমস্ত ভাবনাধারণা— তা ইগো হোক, আর যাই হোক— পুঁজিবাদী সমাজের যে মূল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শোষিত জনগণের যে দ্বন্দ্ব, সেই মূল দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই তার ইগো বা অহম্-এর সাথে তার সুপার ইগো, অর্থাৎ চেতনসত্তা বা বিবেকের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে। একজন বুর্জোয়ার মধ্যেও ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব আছে। এই সমাজ পরিবেশের যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তার মধ্যে রয়েছে, সেটা হচ্ছে তার ইগো। আর পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ সম্পর্কিত যে আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ 'এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট অব ক্যাপিটালিজম্' তার মধ্যে আছে, সেটা হচ্ছে তার সুপার ইগো— যা তাকে 'ন্যাশনালিস্ট' ও 'হিউম্যানিস্ট' করে তুলছে। ফলে তার মধ্যে এই হচ্ছে ইগো এবং সুপার ইগোর সংঘাত। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিমালিকের মধ্যে একদিকে তার ব্যবসার প্রয়োজন, অন্যদিকে তার মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সামগ্রিক প্রয়োজনবোধ— এই হচ্ছে তার ইগো এবং তার সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব। আবার পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের মূল দ্বন্দ্বের মধ্যে একজন শ্রমিক বাস করছে বলে যখন সে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তার সুপার ইগোর রূপ নেয় বিপ্লবী চেতনা। বুর্জোয়া সমাজে বাস করছে বলেই সমস্ত শ্রমিকের সুপার ইগো বিপ্লবী চেতনা নয়— যদিও ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব তার মধ্যেও আছে। যেমন একজন ভদ্রলোক যিনি বিপ্লবী হননি, তাঁর মধ্যেও বিবেক এবং প্রবৃত্তির লড়াই আছে, ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব আছে, অর্থাৎ ভাল-মন্দ তিনিও বোঝেন। তাঁর মধ্যেও একটা মন একটা জিনিস করতে চায়, আর একটা মন বলে— এটা খারাপ, এটা করা উচিত নয়। এই যে তাঁর মন একটা কাজ করতে চাইছে, নানা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা দিচ্ছে যেটা তাঁর বিবেক তাঁকে করতে নিষেধ করছে — সেটা আসছে তাঁর প্রবৃত্তি থেকে, তাঁর ইগো বা অহম্ থেকে। আর একটা হচ্ছে তাঁর সামাজিক চেতনা, সে যেমন করে যতটুকু আয়ত্ত করেছে, যেটা তাঁকে বলছে— না, এটা খারাপ, এটা করো না— সেটাই তার সুপার ইগো বা বিবেক।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি মানুষের সমাজ চেতনার ক্যাটিগরিটাকে অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে, কারোর মধ্যে এটা পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবনাধারণা, কারোর মধ্যে প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণা, আবার কারোর মধ্যে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণার একটা আধাখিচুড়ি হয়ে আছে — অর্থাৎ কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণার প্রভাব — এই দিয়ে তার বিবেকটির গঠন। যার মধ্যে এইভাবে কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণা মিশে আছে, দেখা যায়, কখনও তার বিবেক বলে বুর্জোয়ার পক্ষ নিতে, কখনও তার বিবেক বলে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করতে। কিন্তু সবসময়ই প্রত্যেকের বিবেক তার ব্যক্তিস্বার্থ বা ইগোকে খারাপ কিছু না করতে নির্দেশ করছে। এইভাবে ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যে সবসময়ই হচ্ছে এবং এটা চলতেই থাকবে। যতক্ষণ না উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষের বীজ সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ 'ইনডিভিজুয়াল সাইকোলজি'র, অর্থাৎ ইন্‌ডিভিজুয়ালিটি বা ব্যক্তিসত্তার এই 'ফেনোমেনন' 'এলিমিনেটেড' হবে না। আজকের পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত মানুষেরই ইগো গড়ে উঠছে কমবেশি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রাধান্যে অথবা শ্রমিক ভাবাদর্শের প্রাধান্যে। ফিউডাল ভাবধারা যদি তার মধ্যে মিশ্রিত থেকেও থাকে তবুও তার মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রধান, কি শ্রমিকশ্রেণীর ভাবধারা প্রধান, তা দিয়ে তার চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ 'ডমিনেন্ট' (প্রধান) চরিত্র দিয়েই তা নির্ধারণ করতে হবে। পুরোপুরি সামন্তী ভাবধারায় আজ আর কারোরই চলার উপায় নেই।

সুতরাং সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, অহম্ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তির যে সংগ্রাম, তা যদি বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন, তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির সংগ্রামকে সবসময় সমষ্টির সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। কিন্তু এই সমষ্টিগত সংগ্রামকেও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং ভুলত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা চালানো প্রয়োজন। তাই জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে দলের রুটিন ওয়ার্ক চালানোর মধ্যে কর্মীদের যে একটা ঢিলেঢালা গতানুগতিক মনোভাব আছে তাকে দূর করে কাজের গতিকে যেমন আপনাদের বাড়াতে হবে, তেমনি সাথে সাথে তা সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যদি দেখা যায়, কাজের গতি দ্রুত হচ্ছে, কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না, তাহলে তাতে হবে না। হয়তো ছোটাছুটি করে আপনারা একটা কিছু করে ফেললেন, কিন্তু দেখা গেল, সেই করার পেছনে কোনও পরিকল্পনা নেই, আদর্শগত ভিত্তি নেই, তা সমষ্টিগত পরিকল্পনায় করা হয়নি, তাহলে তা দাঁড়াবে না। তাতে অযথা সময়ের অপব্যবহার হবে। কাজেই আমার বক্তব্য এটা নয় যে, কাজের ক্ষেত্রে আপনারা লাফিয়ে লাফিয়ে কতটা এগিয়ে যেতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা হেঁটেই যাবেন বা সামর্থ্য অনুযায়ী দৌড়েই যাবেন, কিন্তু যাবেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে, সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে। ব্যক্তিগত আচরণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে ঝোঁক প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে, তাকে সমাজচেতনার দ্বারা প্যাটার্ন করে, টিউন করে আপনাদের চলতে হবে।

এইভাবে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে পার্টির কর্মসূচিগুলি যদি আপনারা রূপায়িত করতে থাকেন, এবং সাথে সাথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে কোথায় কী ত্রুটি আছে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে কীভাবে তাকে আরও সুন্দর করা যায় সেই চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে দ্রুত সংগঠনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে আপনারা সক্ষম হবেন। কিন্তু সমালোচনার ধারা যদি আপনাদের এই হয় যে, আপনারা 'ত্রুটি আছে', 'কিছুই হচ্ছে না' শুধু এই বলতে থাকেন, তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। এর অর্থ হচ্ছে, আপনারা কিছু করবার জন্য সমালোচনা করছেন না। আপনারা যে কিছু করছেন না, সেটা আড়াল করার জন্য সমালোচনা

ছয়ের পাতার দেখুন

সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, অহম্ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তির যে সংগ্রাম, তা যদি বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন, তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির সংগ্রামকে সবসময় সমষ্টির সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। কিন্তু এই সমষ্টিগত সংগ্রামকেও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং ভুলত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা চালানো প্রয়োজন। তাই জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে দলের রুটিন ওয়ার্ক চালানোর মধ্যে কর্মীদের যে একটা ঢিলেঢালা গতানুগতিক মনোভাব আছে তাকে দূর করে কাজের গতিকে যেমন আপনাদের বাড়াতে হবে, তেমনি সাথে সাথে তা সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যদি দেখা যায়, কাজের গতি দ্রুত হচ্ছে, কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না, তাহলে তাতে হবে না।

ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপি বিক্ষুব্ধ জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের জন্ম দিয়ে গেল

গত জুন মাসে ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যা ঘটে গেল, তাতে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ মাত্রেই আতঙ্কিত হওয়ার কথা। ভোট শেষ হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট পদে বিরোধী প্রার্থী মির হোসেন মৌসভি ঘোষণা করলেন, 'নির্বাচনে আমি জিততে চলেছি', কিন্তু ভোট শেষ হতেই সরকারি সংবাদমাধ্যম ঘোষণা করল যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহ্‌মেদিনাজাদ মোট ভোটের ৬৩ শতাংশ পেয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই ফলাফল অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষ করে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মৌসভির কাছে তো বটেই, ব্যাপক জনগণের কাছেই গুরুতর আঘাত রূপে আসে। জনগণ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলে। প্রশ্ন তোলে, মাত্র ২০ শতাংশ ভোট গণনার পরই কী করে ফল ঘোষণা করা হয়? ১৬ জুন তেহরানে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মিছিল হয় মৌসভির সমর্থনে, বরং বলা ভাল, নির্বাচনী ফলাফলের বিরুদ্ধে। কারচুপি বিরোধী আন্দোলন আওয়াজ তোলে যে, এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে ইরানি জনগণের ভোট দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকারকেই নির্লজ্জভাবে খর্ব করা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আন্দোলন গোটা দেশে, এমনকী দেশের বাইরেও ছড়িয়ে যায়। মৌসভির সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়, পুলিশের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে নিরাপত্তাবাহিনী ও তার সাথে মৌলবাদীদের জঙ্গি সংগঠন 'বাসিগ'-এর লোকেরা জনগণের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনে। সংবাদে প্রকাশ, ১৬ জুনের বিক্ষোভের পর বাসিগ-এর হাতে নিহত ৭ জনকে গোপনে কবর দেওয়া হয়। নিরাপত্তা বাহিনী ও বাসিগ-এর লোকেরা গভীর রাতে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হোস্টেলে ঢুকে ভাঙচুর করে, লুটপাট চালায়, এমনকী কয়েক জনকে হত্যা করে। এই বর্বরতাকে নিন্দা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এমনকী পার্লামেন্টের স্পিকারও। মৌসভিকে কোনওরকম সমাবেশ না করতে সরকার হুকুম দেয়। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায়, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনে সংবাদ দেওয়া-নেওয়া আটকে দেয়। বেছে বেছে গ্রেপ্তারও শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ জন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মুক্তির দাবি তোলায়, এমনকী মৌসভির স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ পায়। ইরানের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন মৌলবাদী ধর্মগুরু আয়াতোল্লা আলি খামেনেই, আহ্‌মেদিনাজাদের জয়কে 'নিশ্চিত বিজয়' বলে ঘোষণা করে প্রতিবাদকারীদের হুঁশিয়ারি দেন। কিন্তু এবার ইরানের জনগণ, বিশেষত শিক্ষিত অংশ ও নারীসমাজ ধর্মগুরুদের রক্তচক্ষুর কাছে মাথা নোয়াতে রাজি হয়নি।

বস্তুত, এবার ইরানের জনগণ ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মহিলারা প্রাণ সংশয় করে আন্দোলনে নেমেছিলেন, ধর্মগুরুদের হুঁশিয়ারিতেও ভীত হননি। এমনকী তাঁরা "খামেনেই-এর মৃত্যুদণ্ড" দাবি করে স্লোগান তোলেন। ইরানের মতো নির্মম মৌলবাদী শাসনে যেখানে জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এ জিনিস অচিন্তনীয় ছিল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইরানের জনগণের এই লড়াই অন্যান্য দেশের জনগণের সামনেও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই গণআন্দোলনের চাপ এত ব্যাপক হয়েছিল যে, ইরানের মৌলবাদী ধর্মগুরুকেও ভোটের ফল নিয়ে অভিযোগের তদন্ত করার জন্য 'গার্ডিয়ান কাউন্সিল'কে নির্দেশ দিতে হয়। ঐ কাউন্সিল বলে যে, নির্বাচনে কিছু 'বেনিয়ম' ঘটেছে এবং সেজন্য ঘোষণা করে যে, যেসব ভোটকেন্দ্রে বেনিয়ম-এর অভিযোগ তুলেছেন প্রার্থীরা, কেবলমাত্র সেসব কেন্দ্রেই ব্যালটের পুনর্গণনা করা হবে। নতুন করে ভোট নেওয়ার দাবি সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই, মৌলবাদী শাসকদের এই সিদ্ধান্ত প্রতিবাদী জনগণের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

দুঃখের কথা, এমন একটি শক্তিশালী আন্দোলনও ইতিমধ্যেই স্তিমিত হওয়ার পথে। আসলে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনকে ক্রমাগত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে হলে যে ধরনের নেতৃত্ব থাকা দরকার, ইরানের গণআন্দোলনে তা নেই। ফলে, সেই প্রশ্নটাই আবার দেখা দিয়েছে যে, সঠিক ও উপযুক্ত নেতৃত্ব ছাড়া কোনও আন্দোলনই সফল হতে পারে না।

ইরানের মতো একটি নির্মম মৌলবাদী শাসনে, কী করে এমন প্রবল আন্দোলন সম্ভব হল, সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ঐ দেশের ইতিহাসে নজর দেওয়া দরকার।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরান তেলের বিশাল ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। আমেরিকা সহ অনেক সাম্রাজ্যবাদী দেশের দৃষ্টি রয়েছে ঐ তৈলভাণ্ডারের উপর। গত শতাব্দীর বিশের দশকে স্বৈরাচারী শাসক শাহ রেজা ইরানের ক্ষমতা দখল করেন। ইনি আগে একজন আর্মি জেনারেল ছিলেন। '৪০-'৪১ সালে ব্রিটিশ-সোভিয়েত মিত্রশক্তি শাহরেজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৫৩ সালে জাতীয়তাবাদী নেতা মহম্মদ মোসাদেক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ষড়যন্ত্র করে আবার শাহ পরিবারকে ক্ষমতায় ফেরায়। শেষপর্যন্ত ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রবল গণআন্দোলনের চাপে শাহ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও জনগণের শাসক-বিরোধী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আবেগকে বিপথে পরিচালিত করে ও ধর্মীয় মৌলবাদকে আশ্রয় করে আয়াতোল্লা খোমেইনি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসাবে সামনে আসেন ও চূড়ান্ত ধর্মান্ধ মৌলবাদী শাসনের একনায়কত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় ইরানের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল। বামপন্থা ও মার্কসবাদ সম্পর্কেও একটা প্রবল আগ্রহ সে দেশের মানুষের ছিল। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব ও বার বার সে দেশে আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিরোধিতা। পুঁজিপতিশ্রেণীর আরও ভয়ের কারণ ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ। বিপ্লবভীতি থেকে ইরানের পুঁজিপতিশ্রেণী ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে আপস করে ও খোমেইনিকে সামনে নিয়ে আসে।

ইরানের মাটিতে খোমেইনির উত্থান এক অর্থে ধর্মের মোড়কে ফ্যাসিবাদের সূচনা ঘটায়। তালিবান শাসনে আফগানিস্তানে যে অবস্থা হয়েছিল, প্রায় সেরকম অবস্থা হয়েছিল ইরানে। একদিকে উগ্রতা, অন্ধতা, গোঁড়ামি — প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারাকে উৎসাহ দেওয়া হল। অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বাধা দেওয়া হতে থাকল। গণতান্ত্রিক অধিকার, এমনকী স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। নারীর অধিকার হরণ করা হল নির্মমভাবে। পশ্চিমী প্রভাব কাটাবার নাম করে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়সহ অসংখ্য শিক্ষায়তন বন্ধ করে দেওয়া হল। জনগণের মধ্য থেকে যতটুকু প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তাকে চুরমার করে, গণহত্যা করে, কমিউনিস্ট নিধন করে, আর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে খোমেইনি ইরানে ফ্যাসিবাদকে মজবুত করতে চাইলেন।

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা বলে, চরম অত্যাচারী শাসন কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। যতই অত্যাচার হোক, জনগণের প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায় না। ইরানেও মানুষ আবার মাথা তুলল। লড়াই, আন্দোলন হল, শেষমেশ আপাত অর্থে একটা গণতান্ত্রিক ঠাটবাট নিয়ে আসা হল, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সামনে রেখে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের একটা ধাঁচা তৈরি হল— যদিও আসল ক্ষমতা ধর্মীয় নেতাদের হাতে থেকে গেল।

ফলে মানুষের সত্যিকারের মুক্তি তো এলই না, সমস্যারও বিশেষ সুরাহা হল না। ক্ষমতা আসার কিছুদিনের মধ্যেই নতুন শিয়া শাসকগোষ্ঠী সুন্নিশাসিত ইরাকের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী আর তিক্ত লড়াইতে দেশকে জড়িয়ে দিল। এই লড়াই ১৮ বছর (১৯৮০-১৯৯৮) চলেছিল। মানুষের দুর্দশার শেষ থাকল না। অভ্যন্তরীণ সমস্যা আর গণআন্দোলন থেকে মানুষকে বিরত রাখার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে দেশকে সামিল করে দেওয়া হল। সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের এই এক কৌশল। যখনই দেশের মধ্যে গণবিক্ষোভ মাথা তুলতে চায়, 'বহির্শত্রুর দ্বারা দেশ বিপন্ন'— এই অজুহাত তুলে উগ্র জাত্যাভিমানকে হাতিয়ার করে অসচেতন জনশক্তিকে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেওয়া হয়।

ইরানের বর্তমান অবস্থাকে বিশ্বপুঁজিবাদের অনিরসনীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। বাজার সংকট আজ সর্বত্র। ইরানেও তাকে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শাসকরা এবং যে ধর্মগুরুরা তাদের হয়ে কলকাঠি নাড়ছে তারাও বিভক্ত এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিও আসলে ভিন্ন ভিন্ন বুর্জোয়া গোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। মৌসভি কিংবা আহ্‌মেদিনাজাদ কেউই কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসানের কথা বলছেন না। এদের মধ্যে আহ্‌মেদিনাজাদই বর্তমান শাসকচক্রের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। তাঁকে জেতানোর জন্য যে মরিয়া চেষ্টা করা হয়েছে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়।

আহ্‌মেদিনাজাদের তীব্র মার্কিন বিরোধী ও জিয়নিস্ট ইজরায়েল বিরোধী অবস্থান এবং ইরানকে পারমাণবিক শক্তিতে স্বনির্ভর করার ডাক আসলে ইরানের বুর্জোয়াদের শ্রেণী আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করছে। অন্যান্য আরব দেশের মতোই ইরানি জনগণের মধ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েলি ঘাতকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রবল। এই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে একদিকে আহ্‌মেদিনাজাদ চাইছেন জনগণের সমর্থনকে নিজের পক্ষে টানতে, অপরদিকে এই মার্কিন-ইজরায়েল বিরোধী স্লোগানে ইরানের শাসক বুর্জোয়াদের ক্ষতি নেই, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে কিছুটা দরকষাকষির সুযোগ করে দেবে ইরানকে। কেননা ইরানের বুর্জোয়াদের আসলে দরকার পুঁজিবাদের বাজার সংকট কাটিয়ে ওঠার কিছু টোটকা দাওয়াই। এটা না হলে মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

অতএব এটা পরিষ্কার, আহ্‌মেদিনাজাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা আসলে মেকি, যার আসল তাৎপর্য হল বুর্জোয়া স্বার্থে দেশের পুঁজিবাদী শাসন-শোষণকে পোক্ত করা ও সংকটমুক্ত রাখার প্রয়াস। পরমাণু শক্তিবৃদ্ধির স্লোগানেরও একই তাৎপর্য। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিশ্ববাজারে নিজেদের মিলিটারি শক্তিই তো পুঁজিপতিদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র অবলম্বন, যার জোরেই শোষণের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করা ও পরদেশ লুণ্ঠন করা যায়। ইরানও অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো সেই পথেই হাঁটবে একথা বলাই বাহুল্য। এর সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্কই নেই।

অপরদিকে মৌসভিও বর্তমানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইছেন। নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তার মুখে শোনা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও মুমূর্ষু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালীন মৌসভিই ছিলেন ধর্মগুরুদের আশীর্বাদ ধন্য এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি ঠিক উল্টো কাজগুলি করেছিলেন। তিনিই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধ কে মদত দিয়েছিলেন। তিনিই একসময় জনগণের সমস্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হরণ করেছিলেন, যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিলেন জনগণের মধ্যে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদকে সংহত করা। আজ তাঁর মুখে উল্টো কথা শোনা গেলেও বুঝতে কি অসুবিধা হয় তাঁর আসল উদ্দেশ্য কী?

বর্তমান মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের যুগে, সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সারা বিশ্বেই গণতন্ত্রের একটা ঠাটবাট বজায় রাখতে চায়। এটা জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত রাখার একটা কৌশলমাত্র। এর মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতা নেই। বরঞ্চ বলা ভাল, গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকার আসল উদ্দেশ্য হল, মুক্তিসংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলন থেকে যতটা পারা যায় জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখা। ইরানেও একদিকে ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি রেখে দেওয়া হয়েছে খোমেইনির মতো ধর্মগুরুদের হাতে, অপরদিকে পার্লামেন্টের খোলসটা রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ এই চূড়ান্ত শোষণমূলক ও দমন-পীড়নকারী ব্যবস্থার অলিন্দেই ঘুরপাক খায়।

ইরানে নির্বাচনের নামে এই প্রহসন বিশ্বের আরও অসংখ্য ঘটনার মতো দেখিয়ে দিল যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নির্বাচন কোথাও প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ ও অবাধ হতেই পারে না। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সর্বত্রই এই চরিত্র। একদিকে নির্বাচনকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক করার জন্য যেমন জনগণকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যাতে তাদের পছন্দ-অপছন্দকে মর্যাদা দেওয়া হয়। সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা ও পুলিশ, ইন্টেলিজেন্স, বাসিগ, পাসদারানের মতো অত্যাচারী শক্তিগুলিকে অপসারিত করা এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের ও কারারুদ্ধ আন্দোলনকারীদের মুক্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। অপরদিকে আরও একটা দীর্ঘমেয়াদী জঙ্গি লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে আনা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা, স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করবার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এরই পথ বেয়ে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে সর্বদা জাগরূক রাখতে হবে, যাতে বিশেষ করে মার্কিন ও ইজরায়েলি হানাদাররা ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে সাহস না করে।

কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে ইরাকি জনগণকে স্থির করতে হবে কার নেতৃত্বে তারা লড়াই করবেন। নেতৃত্ব যদি হয় মৌসভি কিংবা আহ্‌মেদিনাজাদের মতো, যারা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি, তবে অচিরেই এই লড়াই মুখ থুবড়ে পড়বে, জনমানসে হতাশা নিয়ে আসবে। দেশে দেশে গণআন্দোলনের ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, একটা লড়াইতে কত মানুষ জমায়েত হল, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইনটি সঠিক কি না। এই মূল রাজনৈতিক লাইনই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে সঠিক দিশা দেখাবে।

দ্বিতীয়ত, একটি সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দলের যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে অভ্যুদয় হওয়া চাই। ইরানের মানুষকে এই কঠিন সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের আন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে, গণআন্দোলন চালাতে চালাতেই তাদের আলাদা একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সারা বিশ্বের মেহনতী জনগণ সেই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

চারের পাতার পর

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

করছেন। আপনারা মনে রাখবেন, নিজের সমালোচনার চরিত্র কী, তাও ধরবার কতকগুলো উপায় মার্কসবাদী বিজ্ঞান তুলে ধরেছে। যখন আপনাদের বক্তব্যের মধ্যে শুধু নেগেটিভ ক্রিটিসিজম্ থাকে, বিক্ষোভ থাকে, বিক্ষোভই হচ্ছে যার আধার — অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দলকে কী বাদ দিয়ে কী গ্রহণ করতে হবে, তা আপনারা বলেন না, শুধু এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, এটা কেন হবে, ওরকম করার মানে হয় না, এরকম করলে কী করে হবে — এইসব বলে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন, তখন বুঝতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে, আপনারা যে কিছু করতে পারছেন না, সেইটা যখন ধরা পড়ছে, তখন আসলে অপরের দোষের মধ্যে তার কারণ খোঁজেন।

যাঁরা এভাবে চিন্তা করছেন তাঁদের ভাবতে হবে, তাঁরা নিজেরা কী করেছেন বা পার্টির প্রোগ্রামে যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে কী সেই ত্রুটি এবং কী সেই প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রাম তাঁদের ওখানে নেওয়া দরকার ছিল। এইটুকুই হবে তাঁদের বিচার্য বিষয়। তাঁদের অসন্তুষ্ট হওয়ার বা মন উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কোনও 'পয়েন্ট' এখানে নেই বা বিক্ষোভের কোনও পয়েন্ট নেই। শুধু এইটুকু অতৃপ্তি থাকতে পারে যে, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট নন। আর বাকি সব জিনিসটাই হচ্ছে তাঁদের অহম্, যেটা তাঁদের ঠকাচ্ছে — নিজেরা যে পারছেন না, সেই দোষটাই হয় পার্টির পরিকল্পনা, না হয় সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। হয়তো অনেক সময় এগুলোও 'ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট' হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সেগুলো কংক্রিট পয়েন্ট হিসাবে আসবে। অর্থাৎ কংক্রিটলি বলতে হবে, কী বিশেষ ধরনের প্ল্যান নেওয়া উচিত ছিল যেটা নেওয়া হয়নি, বা অমুক নেতা যে প্ল্যানটা দিয়েছিলেন সেটা ব্যর্থ এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, এইভাবে হলে কাজগুলো হতে পারত। কিন্তু যাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, যাঁরা সমালোচনা করেন, যাঁরা 'রিমার্ক পাস' করেন বা যাঁরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তাঁরা কি এইভাবে কংক্রিট পয়েন্ট তুলে আলোচনা করেন? করেন না। আবার দেখা যায়, একদল কর্মী আছেন, তাঁরা যে এলাকায় কাজ করেন, সেখানে যখন কাজে এগোতে পারেন না, তখন মনে করেন, ঐ জায়গাটাই হচ্ছে স্পেশ্যাল, একটু অন্যরকম, বিচিত্র অসুবিধার জায়গা। তাঁরা মনে করেন, ঐরকম জায়গা অন্য কোথাও নেই। ফলে তাঁরা বলতে থাকেন, এলাকার পরিবেশ ভয়ানক প্রতিকূল, সেইজন্য তাঁরা কিছু করতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁরা পরিবেশের মধ্যে নিজেদের না করতে পারার কারণ খুঁজে বেড়ান। এর দ্বারা আসল কথাটা তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেন না, এবং তাঁরা নিজেদের ঠকান। তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেন না তাঁদের কী করণীয় ছিল, যা তাঁরা করেননি। সেইটিই যদি তাঁরা ধরতেন, তাহলে তাঁরা দেখতেন, ঐসব হাজার অসুবিধার মধ্যেও তাঁদের অনেক কিছু করার ছিল এবং তাঁরা কিছু করতে পারতেন। ফলে প্রতিটি কর্মীর সবসময় এইভাবে আলোচনা করা উচিত। আগে নিজেদের দিক থেকে দেখা উচিত, কী তাঁদের করণীয় ছিল, যা তাঁরা করেননি এবং কোথায় তাঁদের ত্রুটি।

নেতাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও কর্মী একটা কাজ পারেনি। একজন নেতা সেক্ষেত্রে নিজের দিক থেকে প্রথম এই প্রশ্নটা শুরু করবেন যে, তিনি সেই কর্মীটির ক্ষেত্রে, তার ক্ষমতা যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যে যাতে সে পারে, তা করাবার জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং সে ব্যাপারে কর্মীটিকে তিনি কী সাহায্য করেছেন। নেতার নিজের দিক থেকে দেখতে হবে— প্রথমত সেই সাহায্য করার দিকটা ঠিক আছে কি না। তারপর দেখতে হবে, কর্মীটি তার কী কী সীমাবদ্ধতার জন্য কাজটা করতে পারেনি এবং সেই 'অবজেক্টিভ ডিফিকাল্টি'গুলি (বাস্তব অসুবিধাগুলি) কী, সেইগুলো সম্বন্ধে নেতা তাকে ঠিকমত বুঝিয়ে দেবেন। তারপরেও যদি দেখা যায় যে, কর্মীটির যা করার ছিল তা করেনি, তখন তাকে সেইটা পয়েন্ট আউট করতে হবে। কিন্তু নেতারা সবসময় তা করেন না। প্রায়শই যে কর্মীটি পারেনি, তাকে তৎক্ষণাৎ অপদার্থ ধরে নিয়ে চাপাচাপি করেন। কর্মীরা কাজ করতে না পারার জন্য যে দায়িত্বটা নেতাদের ওপর বর্তাচ্ছে, সেই দায়দায়িত্ব এড়াবার ঝোঁকটি অজ্ঞাত সাইকোলজিতে নেতাদের এইভাবে ডিসিভ্ করে। একথার মানে এ নয় যে, নেতাদের দোষের জন্যই কর্মীরা পারছে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, নেতাদের যদি দোষের দিক না থেকে থাকে, তাহলে তাঁরা বিষয়টিকে সঠিকভাবে অ্যাপ্রোচ না করে কর্মীদের ওপর গোড়াতেই মারমুখী হয়ে ওঠেন কেন?

আর একটা কথাও নেতাদের এখানে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, দলের সমস্ত কর্মী এবং সমর্থক এক স্তরের নয়। কাজ করতে না পারার ক্ষেত্রে কর্মীদের বিভিন্ন ধরন থাকে এবং সেইটা বুঝে নানান স্তরে তাদের 'ট্যাক্‌ল' করতে হয়। বিভিন্ন কর্মীর এই যে বিভিন্ন ধরন, সেইটা না বিচার করে একইরকম ঢালাওভাবে, ঢালাও 'ফর্মূলা'য় সব কর্মীকে ট্যাক্‌ল করতে গেলে 'পারটিকুলারিটি অব কন্ট্রাডিকশন'-এর (বিশেষ দ্বন্দ্বের বিশেষ অবস্থা) তত্ত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় একজন কর্মী সৎ হওয়া সত্ত্বেও 'জেনুইন' কতকগুলো 'কন্‌ফিউশন' বা দোষের জন্য — যেগুলি সম্পর্কে সে 'অ্যালার্ট' নয় বা 'অ্যালার্ট' হওয়া সত্ত্বেও 'বিইং ভিক্‌টিম অব সার্টেন হ্যাবিট্‌স অ্যান্ড ট্রেট্‌স' (কিছু ক্ষতিকারক অভ্যাস ও কর্মধারার শিকার হওয়ায়) অনেক সময় নিজেকে রক্ষা করতে পারে না বা চেষ্টা করেও সে পারছে না। সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই কর্মীটিকে সেইগুলো শোধরাবার জন্য নেতাদের বারবার ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করা উচিত। যেখানে সে পারছে না — যেহেতু এটা জানাই আছে খানিকটা যে সে পারছে না — সেখানে তার ওপরে মারমুখী হওয়ার চেয়ে সহানুভূতির সাথে সাহায্য করাটাই হবে নেতাদের বড় কর্তব্য। আবার নেতাদের মনে রাখতে হবে, এই 'সিম্‌প্যাথেটিক্যাল ট্রিট্‌মেন্ট' এবং হেল্‌পটা যেন পার্টি চিন্তা বা পদ্ধতি বহির্ভূত কোনও একজন নেতার শুধুমাত্র ব্যক্তিচিন্তার ওপর ভিত্তি করে না হয়। সেই বিশেষ সমস্যাটা— তার রূপ বা চরিত্র অনুযায়ী 'স্টাডি সার্কেলে' এবং আর পাঁচজনের সামনেও আলোচনা করা যেতে পারে, আবার রূপ ভেদে সবার সামনে না হয়ে নেতাদের মধ্যে বা যাদের সামনে আলোচনা করা যায়, করা যেতে পারে। সব জিনিস সবার সামনে আলোচনা করা না যেতে পারে, কিন্তু পার্টির কারোর না কারোর সামনে আলোচনা করা অবশ্যই উচিত। এটা কেবলমাত্র একজন নেতার ব্যক্তি ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ট্যাক্‌লিং যেন কখনই না হয়। তিনি যেভাবে বিষয়টাকে ট্যাক্‌ল করছেন, সেটা পার্টির তত্ত্ব বা পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া চাই — অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিটি একজন কর্মীকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করছেন সেটা পার্টির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হওয়া চাই। আবার এটাও নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, এই ট্যাক্‌লিং-এর মধ্যে খানিকটা ব্যক্তি মিশে থাকে, যেটা যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তাঁর নিজস্ব। তাঁর দিক থেকে তিনি তাঁর মতন করে করছেন। কিন্তু কোনও সমস্যাকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনমতেই তা পার্টি তত্ত্ব বা উপলব্ধির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত সেই নেতার কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিচিন্তা বা পদ্ধতি হতে পারে না। এইভাবে ট্যাক্‌লিং-এর ফল যদি আপাতদৃষ্টিতে ভালও দেখা যায়, তাহলেও তা করা চলবে না। কারণ ভাল ফল হওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত ভাল ফল বর্তায় না। ভাল ফল বর্তাচ্ছে মনে করে যিনি এইভাবে সমস্যার সমাধান করে দেন, শেষপর্যন্ত তার বেশিরভাগ সময়ই কুফল বর্তে যায়। এই হচ্ছে দলের অভিজ্ঞতা।

ব্যক্তি ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ট্যাক্‌লিং যেন কখনই না হয়। তিনি যেভাবে বিষয়টাকে ট্যাক্‌ল করছেন, সেটা পার্টির তত্ত্ব বা পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া চাই — অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিটি একজন কর্মীকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করছেন সেটা পার্টির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হওয়া চাই। আবার এটাও নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, এই ট্যাক্‌লিং-এর মধ্যে খানিকটা ব্যক্তি মিশে থাকে, যেটা যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তাঁর নিজস্ব। তাঁর দিক থেকে তিনি তাঁর মতন করে করছেন। কিন্তু কোনও সমস্যাকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনমতেই তা পার্টি তত্ত্ব বা উপলব্ধির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত সেই নেতার কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিচিন্তা বা পদ্ধতি হতে পারে না। এইভাবে ট্যাক্‌লিং-এর ফল যদি আপাতদৃষ্টিতে ভালও দেখা যায়, তাহলেও তা করা চলবে না। কারণ ভাল ফল হওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত ভাল ফল বর্তায় না। ভাল ফল বর্তাচ্ছে মনে করে যিনি এইভাবে সমস্যার সমাধান করে দেন, শেষপর্যন্ত তার বেশিরভাগ সময়ই কুফল বর্তে যায়। এই হচ্ছে দলের অভিজ্ঞতা।

যে কর্মীটিকে ট্যাক্‌ল করে দেওয়া হ'ল, সে যদি খুব খুশি হয়েও যায়, তাতেও খুব ভাল ট্যাক্‌লিং হয়েছে, এটা সবসময় প্রমাণ হয় না। কারণ মানুষ বহু কারণে খুশি হয়। ধরা যাক, কোনও লোক একটা কাজ ঠিক করেনি বা তার কোনও একটা আচরণ ঠিক হয়নি। এখন কেউ যদি সেই লোকটিকে ট্যাক্‌লের নামে বক্তব্যের মধ্যে তার সেই বেঠিক কাজ বা আচরণকেই নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'প্যাট্রনাইজ' (সমর্থন) করে যান, আর তার দ্বারা সেই লোকটি খুশি হয়ে চলে যায়, তাহলে কি সমস্যা সমাধান হয়েছে বলা যাবে? সে খুশি হওয়াতে কী হবে? তার সর্বনাশ হবে। কাজেই অখুশি হলেই খারাপ ট্যাক্‌লিং হ'ল, আর খুশি হলেই ভাল ট্যাক্‌লিং হ'ল — এরকম নয় বিষয়টা। তবে ভাল ট্যাক্‌লিং— অর্থাৎ শেষপর্যন্ত ট্যাক্‌লিং সার্থক হয়েছে এর একটা লক্ষণ হচ্ছে, যে গোড়ায় অখুশি হবে সে আলোচনার শেষে খুশি হয়ে উঠে যাবে। আলোচনার শুরুতে যদি দেখা যায়, কেউ অখুশি বা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে বা বুঝতে চাইছে না — এর অর্থ হচ্ছে তার নিজস্ব অহমের সাথে পার্টির ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির বিরোধ লাগছে। তারপরে যখন সে যুক্তির দ্বারা বিষয়টা সত্যি সত্যি বুঝতে পারে, তখন সে খুশি হয়। আবার এরকমও দেখা যায় যে, অনেকে যুক্তিতে মেনে নেয় কিন্তু খুশি হয় না। এরকম হলে বুঝতে হবে, যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তিনি খানিকটা সফল হয়েছেন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। অর্থাৎ আলোচনার শেষে যার সাথে আলোচনা হচ্ছে, তিনি বক্তব্যটা ঠিক বলে মেনে যান, কিন্তু মুখটা তার হাসিখুশিতে জ্বলজ্বল করে না, বিষাদাচ্ছন্ন এবং গম্ভীর হয়ে তিনি উঠে যান— তাহলে বুঝতে হবে, যিনি ট্যাক্‌ল করছেন, তিনি খানিকটা সাক্‌সেসফুল হয়েছেন, পুরোপুরি নয়। এগুলো হচ্ছে খুব 'পারফেক্‌শনে' (নির্ভুল) ট্যাক্‌ল করার 'মেথড' হিসাবে যে দিকটায় নেতাদের নজর রাখা প্রয়োজন তার কথা। নেতারা যদি মারমুখী না হয়ে যুক্তি দিয়ে কারোর বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি সেই কর্মীটির ভুল ধরতে পারবেন এবং ভুল ধরতে পারলে, তা তাকে দেখাতে পারবেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, ভুল দেখাতে পারলে তা নেতাকেও ভুলের উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা কথা হচ্ছে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে কোনও জিনিসের অগ্রগতি হয় না। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যদি চিন্তার সংঘর্ষ না থাকে তবে নেতাদেরও অগ্রগতি হয় না, কর্মীদেরও হয় না।

বর্তমান পরিস্থিতির আহ্বান

কমরেডস্, আজকের পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে একটু কঠিন মনে হলেও বিপ্লবীরা জানে, এরকম হাজার বাধা-বিপত্তির মধ্যেই তাদের কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তির সামনে সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, আর কষ্টসাধ্য সংগ্রাম শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে। ইতিহাসের এইটাই শিক্ষা। এই শিক্ষা মনে রেখেই আপনাদের ধৈর্যের সাথে পরিকল্পনা করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে যেতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে করে ক্রমাগত নিজেদের কাজের পদ্ধতি উন্নত ও নিখুঁত করার চেষ্টা চালাতে হবে। পার্টির বিপ্লবী রাজনীতিকে আপনাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়ত্ত করতে হবে এমনভাবে, যাতে যে কোনও পরিস্থিতিতেই আপনারা জনগণের কাছে সঠিকভাবে পার্টি লাইন উপস্থিত করতে পারেন, তার সঠিকতা নিঃসংশয়ে জনগণকে বোঝাতে পারেন এবং সুবিধাবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো যারা আজও জনগণকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী দল সম্পর্কে আস্থা ও ভরসা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে পারেন, এই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলিই হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে খতম করা যায় না। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তেছে তা সম্পন্ন করার জন্য প্রথমত প্রয়োজন একটি সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন, দ্বিতীয়ত দরকার পরিস্থিতিকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে যাবার মতো উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি, তৃতীয়ত দরকার উন্নত সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির আধারে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করে সেই সংগ্রামগুলো জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটিগুলোর মধ্য দিয়ে এমনভাবে পরিচালনা করা, যাতে এই গণকমিটিগুলো শেষপর্যন্ত জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে। এইটা করার জন্য যত দ্রুত একদিকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকে সমস্ত অংশের মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আপনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং অন্যদিকে আদর্শগত ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে পারবেন, তত দ্রুত এবং ততদূর পর্যন্ত আপনারা শ্রমিক-চাষী ও মেহনতি জনগণের চেতনার মানের উন্নতিতেও সাহায্য করতে পারবেন। এবং যত দ্রুত আপনারা এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবেন, বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণটিও তত কাছে এগিয়ে আসবে। আমি এই আশা নিয়েই আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, আপনারা এই চ্যালেঞ্জ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন এবং এই সংগ্রামে সকল শক্তি নিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করবেন।

('যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক', নির্বাচিত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড)।

দেশে দেশে শ্রমিক সংগ্রাম

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সেরকম কিছু আন্দোলন ও ধর্মঘটের খবর এখানে প্রকাশ করা হল। এসব খবর সাধারণত বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমে স্থান পায় না। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই আন্দোলনগুলির খবর চেপে রাখার পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমের অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রয়াস।

চিলি ঃ স্বর্ণখনির শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল

মিনেরা মানটোম দ্য ওরো চিলির এক উল্লেখযোগ্য স্বর্ণখনি। গত ৯ জুলাই এই খনিতে নিযুক্ত ২৯০ জন শ্রমিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক ধর্মঘটে সামিল হন। রাজধানী সানতিয়াগো থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার উত্তরে আটাকামা মরুভূমিতে অবস্থিত এই খনিটির মালিকানা এখন কানাডার কোম্পানি কিনারোম গোল্ড কর্পোরেশনের হাতে। প্রতিদিন এই খনি থেকে প্রায় ৮০০ আউন্স অর্থাৎ সাড়ে বাইশ কেজিরও বেশি সোনা উত্তোলন করা হয়। অথচ খনি শ্রমিকদের মজুরি খুবই কম। শ্রমিকরা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান মজুরির উপর অন্তত ৬.৮ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তাঁরা এই ধর্মঘটে সামিল হন।

কারারক্ষীদের আন্দোলনের সমর্থনে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট

চিলির সরকারি কর্মচারীরা সে দেশের কারারক্ষীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে গত ৯ জুলাই ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটে সামিল হলেন। কারারক্ষীদের আন্দোলনের দাবি— কাজের পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে এবং বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সেদেশের মিশেল বাশেলে সরকার এই আন্দোলন ভাঙতে ইতিমধ্যেই কারারক্ষীদের দু'টি সংগঠনের সাথে একটি চুক্তি করেছে। কিন্তু বাকি দু'টি ইউনিয়ন কারারক্ষীদের স্বার্থবিরোধী এই চুক্তিতে রাজি না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিনের ধর্মঘটে ৭০ হাজারেরও বেশি কর্মচারী যোগ দেন।

পেরু ঃ লৌহখনির কর্মচারীরা ধর্মঘটের হুমকি দিল

মাউগং হিয়েরো পেরু হল এ'দেশের একমাত্র আকরিক লোহার খনি। পুঁজিবাদী চীনের সরকারি সংস্থা সাউগং কোম্পানি এখন খনির মালিক। এই খনিতে বর্তমানে যে ১১৮৪ জন কর্মচারী কাজ করেন, তাঁদের বেতন সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। তাঁরা দাবি তুলেছেন, নতুন কর্মচারীদের বেতন ৩৩ সোলেস থেকে বাড়িয়ে ৪৩ সোলেস এবং পুরনো ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের বেতন ৫৫ সোলেস থেকে বাড়িয়ে অন্তত ৬৫ সোলেস করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নিলে তাঁরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আর্জেন্তিনা ঃ বাহিয়া ব্লাঙ্কার রাসায়নিক কর্মীদের ধর্মঘট

গত ৯ জুলাই আর্জেন্তিনার বাহিয়া ব্লাঙ্কা শহর এক অভূতপূর্ব ধর্মঘটের সাক্ষী হয়ে রইল। এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন ডাউ, প্রফেটিল ও সলভে ইনদুপা রাসায়নিক কারখানার শ্রমিকরা। দাবি তুলেছিলেন, অন্তত ২৫ শতাংশ বেতনবৃদ্ধি করতে হবে এবং ন্যূনতম মাসিক বেতন ৮০০ ইউএস ডলারের কম হওয়া চলবে না। বন্ধ চলাকালীন কর্মীরা পিকেটিং শুরু করে কারখানা, বন্দর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যাওয়ার পথ আটকে দেন। ফলে ঐসব কারখানার শ্রমিক এবং অফিস কর্মচারীরাও কাজে যোগ দিতে পারেননি।

পুয়ের্তো রিকো ঃ সরকারি কর্মচারীরা দেশজুড়ে ধর্মঘটের হুমকি দিল

গত ১০ জুলাই পুয়ের্তো রিকোর সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, পূর্ব ঘোষণা মতো ৩০ হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করার নির্দেশ কার্যকর করতে সরকার কোনও পদক্ষেপ নিলেই তারা সার্বিক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর সমন্বয়ী ও সংগ্রামী সংগঠন 'ফাসিল'-এর মুখপাত্র লুইস পেড্রাজা লেড়ুক এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যদি একজন কর্মচারীও ছাঁটাই হন তাহলে সরকারকে অনির্দিষ্টকালের সর্বাত্মক ধর্মঘটের মুখোমুখি হতে হবে।

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে ফরচুনো ৩২০ কোটি ডলারের সরকারি ঘাটতির উল্লেখ করে ৩০ হাজার সরকারি কর্মচারীকে ছাঁটাই-এর কথা ঘোষণা করেন। লেড়ুক, গভর্নর লুইস ফরচুনোর অনুসৃত নীতিকেই এর জন্য দায়ী করেন। পুয়ের্তো রিকোতে জনসাধারণের ১৫ শতাংশই বেকার। তার ওপর এই সিদ্ধান্ত, লেড়ুকের মতে, শুধুমাত্র সরকারি কাজের পরিমাণই কমাবে না, বেসরকারি মালিকদেরও ছাঁটাইয়ে উৎসাহিত করবে। এর মধ্যে শুধু গত সপ্তাহেই বেসরকারি কোম্পানিগুলো সে দেশে ১৩ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। ছাঁটাইয়ের জন্য চিহ্নিত বেশ কিছু সরকারি কর্মচারী ইতিমধ্যে হতাশায় আত্মহত্যাও করেছেন। এই পরিস্থিতিই সরকারি কর্মচারীদের সে দেশে এককাট্টা হয়ে ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করছে।

চীন ঃ বাসচালকদের তিনদিনের ধর্মঘট

চীনের ইয়ুনান প্রদেশের বেসরকারি পরিবহন সংস্থা উ-ডিং ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানির বাসচালকরা তিনদিন লাগাতার ধর্মঘট শেষে আবার কাজে যোগ দিলেন। এই কোম্পানি এতদিন চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন বাস চালাত। সম্প্রতি তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঠিকার ভিত্তিতে নেওয়া ওই বাসগুলি বাতিল করে নিজেরাই বাস কিনে চালাবে। স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ দাঁড়ায়, এতদিন ঠিকার ভিত্তিতে নেওয়া বাসগুলির চালকরাও একই সাথে কর্মহীন হয়ে পড়বে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ দিতেও অস্বীকার করে। প্রতিবাদে চালকরা এই ধর্মঘট ডাকে। ধর্মঘট চলাকালীন ঐ অঞ্চলের সরকারি অফিসাররা ধর্মঘটী বাসচালকদের সাথে দেখা করে বাস কোম্পানির সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় মধ্যস্থতা করার আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসেই আপাতত ধর্মঘট ওঠে। পুঁজিবাদ ফিরে আসার পর চীন জুড়ে বেসরকারীকরণের ঢেউ বইছে।

ভিয়েতনাম ঃ কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট

তাইওয়ানের হাওয়াতা ভিনা কোম্পানির হো চি মিন সিটি (সায়গন)-এর কারখানা থেকে গত ৩ জুলাই ৩ শতাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন। কর্তৃপক্ষের জারি করা দানবীয় নিয়মকানুনের প্রতিবাদেই তাঁরা এই কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রমিকরা জানান এই কারখানায় জলের ট্যাঙ্ক ও রান্নাঘরের নানা সাজসরঞ্জাম তৈরি করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেখানে কাজের নানা অদ্ভুত নিয়ম চালু করেছে। তারা শ্রমিকদের এমনকী শৌচাগারে যাওয়ার সময়টুকুও কাটছাঁট করার চেষ্টা করছে। লোডশেডিং-এ কাজ বন্ধ থাকলেও, তার দায় শ্রমিকদের নিতে হচ্ছে, তাঁদের মজুরি কাটা যাচ্ছে।

এর ওপর হুকুম জারি হয়েছে, কাজ শুরু হবার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ২০ মিনিট আগে শ্রমিকদের কারখানায় উপস্থিত হতে হবে। কোনও কারণে যদি কারোর সামান্য দেরি হয়ে যায়, তবে তার ১ লক্ষ ডং (৫.৬০ ডলার) মজুরি কাটা যাবে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উচ্চপদস্থ অফিসাররা শ্রমিকদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে থাকেন। শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান। শেষপর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টর ঐ ধরনের ব্যবহারের জন্য শ্রমিকদের কাছে ক্ষমা চাইলে এবং তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা আবার কাজে যোগ দেন।

মালিকদের নিয়োজিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ২৯ জুন ঢাকায় গণতান্ত্রিক বামমোর্চার মিছিল ও সমাবেশ।

শিক্ষক সংগঠনের প্রধান কার্যালয়ে দক্ষিণ কোরীয় পুলিশের হানা

গত ৩ জুলাই সিভিল পুলিশের প্রায় ৫০ জনের একটি দল কোরীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ইউনিয়নের (কেটিইউ) হেড অফিসে এবং সাডাং ডং-এ তাদের শাখা অফিসে হানা দেয় এবং সেখানে রক্ষিত বিভিন্ন প্রামাণ্য নথি ও কমপিউটার হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে। প্রসঙ্গত, ঐ শিক্ষা সংগঠনের সদস্য শিক্ষকরা বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ও নাগরিক স্বাধীনতার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ঐ আন্দোলনের সপক্ষে দাবিপত্রে যে ১৭ হাজার শিক্ষক সই করেছেন, তাদের সকলের বিরুদ্ধেই দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান লি সরকার আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

সিওলের প্রসিকিউটর'স অফিস ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের ৮৮ জন নেতৃত্বকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তাদেশ জারি করেছে। ইউনিয়নের ১০ জন পদাধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং আরও ৭৮ জন আঞ্চলিক নেতাকেও সাসপেন্ড করার নির্দেশ জারি হতে চলেছে। আর যে হাজার হাজার শিক্ষক দাবিপত্রে সই করেছিলেন, তাদের সকলের বিরুদ্ধেও সরকার শৃঙ্খলাভঙ্গকারী হিসাবে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সরকারের এইভাবে শিক্ষকদের শাস্তিদানের উদ্যোগকে সে দেশের শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই ভালো চোখে দেখছেন না। গত সপ্তাহে তাঁরা এর প্রতিবাদে চেওং ওয়া দে (রাষ্ট্রপতির অফিস) অভিমুখে একটি মিছিলও বের করেন। পুলিশ সেই মিছিল থেকেও নেতৃত্বকারী ১৬ জন শিক্ষক নেতাকে গ্রেফতার করে।

কিন্তু এত দমনপীড়নেও সরকার সে দেশের শিক্ষকদের বশ্যতা মানাতে সক্ষম হয়নি। সরকার ও কর্তৃপক্ষের সমস্ত হুঁশিয়ারিকেই অগ্রাহ্য করে কেটিইউ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ হিসাবে আবার একটি দাবিসনদ পেশ করতে চলেছে ও বর্তমানে সেই দাবির সপক্ষে সই সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছে। ৭৬,০০০ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক সংগঠনটির এই আন্দোলন সে দেশে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছে।

পেমেন্টের দাবিতে কিয়া কারখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘট

কিয়া মোটরস কর্পোরেশন দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা। ৩০ জুন এই সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীরা সংস্থার তিনটি কারখানায় একযোগে ৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করে। তাদের দাবি ছিল, অবিলম্বে সংস্থার কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে একটা নতুন ওয়ার্ক-এগ্রিমেন্ট চালু করতে হবে। কিন্তু গত ৭টি সেশন ধরে এই নিয়ে আলোচনার নামে শুধু কালক্ষেপই হয়ে চলেছে। শ্রমিকদের দাবি, তাদের মাসিক মূলভাতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দুশো পারসেন্ট বোনাস দিতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া ঃ তোশিবা কারখানার ধর্মঘট ৩ মাস পার হল

গত ১৬ এপ্রিল থেকে ইন্দোনেশিয়ার ফেদেরাসি সরিকত পেকেরিয়া মেটাল কারখানায় যে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, তা তিন মাস পেরিয়ে গেল। কারখানার ম্যানেজমেন্টের সাথে শ্রমিক ইউনিয়নের যে লেবার এগ্রিমেন্ট সই হয়েছিল, কারখানার মালিক তোশিবা সংস্থা তা মানতে অস্বীকার করলে এই ধর্মঘট শুরু হয়। ৭০০'রও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী এই ধর্মঘটে যোগ দেয়।

শ্রমিকদের দাবি ছিল কর্তৃপক্ষকে ঐ চুক্তির মর্যাদা দিতে হবে এবং আন্দোলন গড়ে তোলার অপরাধে যে ১৫ জন শ্রমিক নেতাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের পুনর্বহাল করতে হবে। কর্তৃপক্ষ এরপর ধর্মঘটী শ্রমিকদের পূর্ব জাকার্তা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ফ্যাক্টরি থেকে বের করে দেয় এবং জানায় শ্রমিকরা তাদের সমস্ত দাবি তুলে নিলে, তবেই তাদের আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরই প্রতিবাদে শ্রমিকরা এখনও তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বস্বান্ত বোরো চাষিদের গণঅবস্থান কোচবিহারে

কখনও বন্ধ্যা গম বীজের জন্য, কখনও ভেজাল পাট বীজের জন্য কখনও বা আলুর ধসা রোগের জন্য কোচবিহার জেলার চাষিরা ফলনে মার খেয়ে যাচ্ছে। খেতে গম জ্বালিয়ে দেওয়া, বীজ ব্যবসায়ীর দোকান ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো, বা এসডিও অফিসে ধর্নায় বারবার সামিল হয়েছে জেলার কৃষকরা। ১৩ জুলাই বোরো চাষিরা আবারও বিভিন্ন মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে গণঅবস্থানে সামিল হয়। তাদের দাবি, বিঘাপ্রতি ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; কারণ চিটা রোগে তাদের অধিকাংশ ধান নষ্ট হয়ে গেছে। বাকিটুকু সাম্প্রতিক আয়লা ও শিলাবৃষ্টিতে ঝরে পড়ে গেছে। কিন্তু সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে উদাসীন। কোচবিহার জেলা 'আলু, পাট, ধান চাষি সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষে নৃপেন কার্যী জানান, বোরো চাষিদের মিনিকিটের জন্য জেলা কৃষি দপ্তর থেকে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হলেও আজও সরকার তা বরাদ্দ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এদিন তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে, সিতাই থানায় এবং কোচবিহারের সাতমাইলে অবস্থান পালিত হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ দেবেন বর্মন, আছরুদ্দিন আহমেদ, মানিক বর্মন, সাবু রায়, বিনোদ রায়, তারাকান্ত রায়, নৃপেন কার্যী প্রমুখ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের অবসানেই সত্যিকারের পরিবর্তন

তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ স্মরণ সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত ১৩ জন শহিদের স্মরণে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি বছরের মতো এবারও ২১ জুলাই ধর্মতলায় এক সমাবেশের ডাক দেয়। এই উপলক্ষে এদিন ধর্মতলায় কয়েক লক্ষ মানুষের বিরাট সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। শহিদ স্মরণে শপথ বাক্য পাঠ করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মদন মিত্র। তৃণমূল কংগ্রেস-এস ইউ সি আই জোটের ২০ জন সাংসদ সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

শহিদ দিবসের সভায় বক্তব্য রাখার জন্য এস ইউ সি আইয়ের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কমরেড প্রভাস ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য

আমি প্রথমেই ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদদের স্মৃতির প্রতি সংগ্রামী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে আমি বলতে চাই, যে কোনও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, মুক্তি সংগ্রামে, শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনে যাঁরাই সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণে প্রাণ হারায়, আমরা তাঁদের শহিদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করি। শহিদ দিবস পালন করি এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে, পরবর্তী কালে যারা লড়াই গড়ে তুলবে, তারা যাতে এই শহিদদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা পান।

আপনারা জানেন, আর কয়েক দিন বাদেই ১১ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ক্ষুদিরামের স্মরণ দিবস উদযাপিত হতে চলেছে। এই ক্ষুদিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে আরও কত শত যুবক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা এ কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আরও শত শত শহিদ হবে। কিন্তু এটাই আজ মর্মান্তিক সত্য। তার কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটলেও ভারতে কায়েম হয়েছে ভয়াবহ পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন। যে ভারতকে একদিন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা দেখেছিলেন, বিপ্লবীরা, মনীষীরা দেখেছিলেন, সেই ভারত সে সময়ের তুলনায় আজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নীতি-নৈতিকতা সমস্ত দিক থেকে ভয়ঙ্কর সংকটে জর্জরিত। মনুষ্যত্ব-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সব ক্ষেত্রেই আজ ভয়াবহ সংকট। এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদ। কোনও দল চাক বা না চাক, নেতৃত্ব দিক বা না দিক, এই সংকটগ্রস্ত মানুষ বার বার প্রতিবাদে মাথা তুলবেই, লড়াই করবেই। প্রতিবার আন্দোলন গমকে গমকে ফেটে পড়বে। কোনও রাষ্ট্রশক্তির সাধ্য নেই একে দমন করার। সত্যিকারের পরিবর্তন যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এই পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের অবসান। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অবসান মার্কসবাদী পথে হবে না গান্ধীবাদী পথে হবে, ভোটে হবে না বিপ্লবে হবে, শান্তিপূর্ণ না সশস্ত্র পথে হবে, আগামী দিনে তা জনগণই ঠিক করবে।

আমি আপনাদের বলতে চাই, যে অত্যাচারী সিপিএম সরকার ২১ জুলাই ১৩ জনকে শহিদ বানাল, '৯৩ সালের আগে এবং পরেও আরও বহু মানুষকে খুন করেছে, শহিদ করেছে, সেই সিপিএমও একদিন শহিদ দিবস পালন করেছিল। '৫৯ ও '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভে মালা দিয়েছিল। সেদিন তারা অনেক কথা বলেছিল, এ রাজ্যের মানুষ তাদের অন্ধভাবে সমর্থনও করেছিল। সেই সিপিএম এখন সরকারে বসে দেশি-বিদেশি পুঁজির গোলামি করছে। তারা মনে করেছিল, দেশি-বিদেশি পুঁজির গোলামি করলে, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে দলের অধীনে আনতে পারলে, ক্রিমিনাল বাহিনীকে কন্ট্রোল করতে পারলে তারা চিরস্থায়ীভাবে সরকারে থাকতে পারবে। আপনারা জানেন, গত ৩২ বছর ধরে দেশি-বিদেশি পুঁজির গোলামি করে এ রাজ্যে তারা কী করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এর যোগ্য জবাব দিয়েছে বিগত লোকসভা নির্বাচনে। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে জনগণ প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি, আইন-কানুন ইত্যাদি সবকিছুর চাইতে বেশি শক্তিশালী হচ্ছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলনের শক্তি। আপনারা জানেন, আমাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের ঐক্য গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ে, যখন সিঙ্গুরের মানুষ আর্তনাদ করছে, নন্দীগ্রামে গরিব মানুষের রক্ত ঝরছে, নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, অনেকেই শহিদ হচ্ছেন, তখন আমরা সিপিএমের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের প্রয়োজনে মার্কসবাদী হয়েও গান্ধীবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমাদের এই ঐক্য থাকবে যতদিন গণআন্দোলনের স্বার্থে এই ঐক্যের প্রয়োজন থাকবে। আগামী দিনে অবাঞ্ছিত হলেও কখনও যদি এই ঐক্যে ব্যাঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, তখনও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদাভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট থাকবে। এ কথা বলেই আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

সভার শেষ বক্তা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাই আমাদের কাজ করে দেখাতে হবে। সিপিএম ভয় পেয়ে খুন-সন্ত্রাস করছে, আমাদের কর্মীদের হত্যা করছে, আমরা বদলার পথে যাব না, ওটা কুশিক্ষা, ওটা আমরা শিখব না। আমরা এর বদলা নেব রাজনৈতিক কর্মসূচি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, উন্নয়ন আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকার থেকে সিপিএমকে সরাতে পারলে বাংলার প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটবে। ওরা কাজ করে না, করতে দেয় না, আমরা কাজ করব। আমাদের সরকারে আমরা-ওরা থাকবে না, আমাদের থাকবে। আমরা সকলকে নিয়ে কাজ করতে চাই। দলতন্ত্র নয়, আমরা গণতন্ত্রে জোর দেব। আমাদের একটাই লক্ষ্য, সকলের জন্য ভাত চাই, কাজ চাই, আমরা প্রকৃত উন্নয়ন চাই।

উপস্থিত দলের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে মমতা ব্যানার্জী বলেন, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করলে আপনাদের পাশে থাকব না। মানুষ আপনাদের ভোট দিয়েছে, মানুষের জন্যই ভাল কাজ করবেন। নিজেরা ভাল মানুষ না হলে মানুষ তৈরি করা যায় না। নম্রতা চাই, বিনয় চাই। দাম্ভিক নয়, আমরা চাই বিনয়ী মানুষ। তিনি একগুচ্ছ দলীয় কর্মসূচি এদিন ঘোষণা করেন।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সোমেন মিত্র, সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদ, শুভাপ্রসন্ন, কবীর সুমন, মহাশ্বেতা দেবী, সুনন্দ সান্যাল, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, রিজওয়ানুর রহমানের মা কেশোয়ার জাঁহা প্রমুখ। সভায় যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবীর সুমন ও নচিকেতা।

লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে হাবড়ায় অবরোধ

সারা রাজ্যের মতো উত্তর ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে চলছে ভয়াবহ লোডশেডিং। এর বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের ক্ষোভকে আন্দোলনে রূপায়িত করতে অ্যাবেকা ১৩ জুলাই হাবড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ শুরু হতেই স্থানীয় মানুষ এবং দোকানদাররাও জড়ো হতে থাকেন। অবরোধ চলে প্রায় ২ ঘণ্টা। হাবড়া থানার আই সি সহ পুলিশবাহিনী অবরোধ তুলতে চেষ্টা করলে অ্যাবেকার নেতৃত্ব বলেন 'দীর্ঘদিন ধরে আবেদন-নিবেদন-ডেপুটেশন দিয়েও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির কোনও সমাধান হচ্ছে না। আগাম ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশনের সংবাদ জানিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেও আজ ডি এম অফিস ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে, বাধ্য হয়েই আমরা রাস্তায় নেমেছি, অবরোধে সামিল হয়েছি।' এরপর বাধ্য হয়ে পুলিশ-প্রশাসন ডি এম-কে ব্যারাকপুর সার্কেল অফিস থেকে আনিয়ে আলোচনার টেবিলে বসাবার উদ্যোগ নিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

আলোচনায় দাবি তোলা হয় (১) রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অধিক মুনাফার জন্য বাইরের রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে এবং এ রাজ্যে লোডশেডিং সৃষ্টি করছে। এই লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে। (২) জেলায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের জন্য ১৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হচ্ছে না। অবিলম্বে তা শুরু করতে হবে। (৩) নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের থেকে কোটেশনের টাকা জমা নিয়েও বছরের পর বছর তাদের মিটার দেওয়া হচ্ছে না, অবিলম্বে তাদের মিটার দিতে হবে। বিদ্যুৎ আইনে বলা আছে, কোটেশনের টাকা জমা পড়ার ১ মাসের মধ্যে মিটার দিয়ে লাইন সংযোগ না করলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য গ্রাহককে ৫০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফলে মিটার না দেওয়া পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৪) স্থায়ী ও অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের পিএসসি সহ নানা সমস্যা সমাধান করতে হবে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র ও হাবড়া লোকাল সম্পাদক উৎপল সিনহা, সাধন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঘোড়াঘাটায় দূষণ বন্ধের দাবিতে রেলঅবরোধ

হাওড়া জেলার বাগনান ব্লকের ঘোড়াঘাটা কৃষ্ণা টিসু প্রাইভেট লিমিটেডের (পেপার মিল) ভয়াবহ দূষণ প্রতিকারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ২৩ জুলাই দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ঘোড়াঘাটা স্টেশনে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক সাধারণ মানুষ রেল অবরোধে সামিল হন। অবরোধে নেতৃত্ব দেয় 'কৃষ্ণা টিসু দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'। এছাড়াও আন্দোলনে সামিল হয় হাওড়া জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সহ ঘোড়াঘাটা আইডিয়াল কে জি স্কুল, নবাসন হাইস্কুল, টেপুর হাইস্কুল, কাঁটাপুকুর হাইস্কুল, বাগনান হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কমিটির মূল দাবি এলাকায় কারখানা হোক, কিন্তু কোনও মতেই হাজার হাজার মানুষের প্রাণ-সম্পদ-সম্পত্তি ও চাষ-আবাদের ক্ষতি করে নয়।

সকাল ১০টায় শুরু হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধের পর উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাগনান-২ ব্লকের বিডিও অবরোধ স্থানে উপস্থিত হয়ে ২৯ জুলাই কলকাতার পরিবেশ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আহূত শুনানিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

২০০৬ সালে ঘোড়াঘাটা স্টেশন সংলগ্ন মাদারী-বরুন্দা মৌজায় প্রায় ৫০ একর জমিতে কৃষ্ণা টিসু প্রাইভেট লিমিটেড কারখানা গড়ে ওঠে। বর্তমানে ঐ মিলের বর্জ্য অ্যাসিডযুক্ত দুর্গন্ধ জল-ধোঁয়া-মাটির দূষণে ঘোড়াঘাটা-পিপুল্যান-মাদারী-হেলেদ্বীপ-কাঁটাপুকুর-নবাসন সহ ২০-২৫টি গ্রামের ২৫-৩০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা জেরবার হচ্ছে। ঐ দুর্গন্ধযুক্ত কালো দূষিত জল এলাকার সব্জি, ধান, পান, মাছ, ফুল চাষের ভয়ানক ক্ষতি করছে, গবাদি পশু নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এলাকার মানুষের মধ্যে ফুসফুস সহ চর্মরোগেরও ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে। পিতল-কাঁসা-সোনা-রূপা সহ বিভিন্ন ধাতুর উপর বিক্রিয়া ঘটিয়ে ঐ সমস্ত ধাতুর রং কালো করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, টিউবওয়েলের জলে দূষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে।

কৃষ্ণা টিসু দূষণ প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবুল হাসেম খলিফা ও নিখিলরঞ্জন বেরা বলেন, মারাত্মক ঐ দূষণ প্রতিরোধের দাবিতে বিডিও, এসডিও, জেলাশাসক, পরিবেশমন্ত্রী, উদ্যান পালন বিভাগের মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তাব্যক্তিদের কাছে বার বার দাবি জানিয়েও কোনও প্রতিকার না হওয়ায় আমরা এই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in